ইস্কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
অমৃতের সন্ধানে

শ্রীশ্রী গুরু—গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমৃতের সন্ধানে

ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য)

দশম বর্ষ ❒ প্রথম সংখ্যা ❒ জানুয়ারী ❒ ফেব্রুয়ারী ❒ মার্চ ২০০৫ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ(ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

নির্বাহী সম্পাদক ঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দাস ব্রহ্মচারী

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রী অজিতেষ কৃষ্ণ দাস

বাংলাদেশ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রধান উপদেষ্টা ঃ শ্রী ননী গোপাল সাহা

বিশেষ উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, অবসরপ্রাপ্ত ডি আই জি (কারাগার)

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল

শ্রী সুদর্শন কৃষ্ণ দাস

স্বত্বাধিকারী ঃ **ইস্‌কন্ ফুড ফর লাইফ**

ভিক্ষা মূল্য ঃ প্রতি কপি- ১৫.০০ টাকা

এবং বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা–

১। সাধারণ ডাকে - ৭০.০০

২। রেজিঃ ডাকে - ৯০.০০

মুদ্রণে ঃ নয়ন গ্রাফিক্‌স, ঢাকা

কম্পোজ ঃ কম্পিউটার এন্ড ডিজাইন

যোগাযোগ করুন

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'

৭৯, ৭৯/১, স্বামীবাগ রোড,
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'

৫ চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট,
বনগ্রাম (ওয়ারী) ঢাকা-১২০৩
ফোন ঃ ৭১১৬২৪৯

প্রচ্ছদ পট

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে কৃপা করে প্রথমে তাঁর দিব্য ষড়ভুজরূপ দর্শন করান, পরে তাঁর চতুর্ভুজরূপ এবং শ্যামসুন্দর , বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রদর্শন করালেন। ষড়ভুজরূপে, শ্রীগৌর সুন্দরের ছয়বাহু বিশিষ্ট রূপ, তাঁর তিনটি অবতারের প্রতীক। দু-হাতে রামচন্দ্রের ধনুর্বাণ, দু-হাতে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী এবং দু-হাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দণ্ড ও কমণ্ডলু। তা' দেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করলেন।

একাদশীর পারণের সময়সূচী

গৌরাব্দ-৫১৯ ; বঙ্গাব্দ ঃ ১৪১১-১৪১২; খ্রীষ্টাব্দ ঃ ২০০৫

তারিখ / বার		একাদশীর নাম	পারণের সময়
০৭/০১/০৫	২৪শে পৌষ, শুক্রবার	সফলা একাদশী	পরদিন ৬.৪৩ মিঃ হতে ১০.১৭ মিঃ মধ্যে
২১/০১/০৫	৮ই মাঘ, শুক্রবার	পুত্রদা একাদশী	পরদিন ৬.৪২ মিঃ হতে ৯.০৪ মিঃ মধ্যে
০৫/০২/০৫	২৩শে মাঘ, শনিবার	ষট্‌তিলা একাদশী	পরদিন ৬.৩৭ মিঃ হতে ১০.২১ মিঃ মধ্যে
১৯/০২/০৫	৭ই ফাল্গুন, শনিবার	ভৈমী একাদশী	পরদিন ৮.৫০ মিঃ হতে ১০.১৭ মিঃ মধ্যে
০৭/০৩/০৫	২৩শে ফাল্গুন, সোমবার	বিজয়া একাদশী	পরদিন ৬.১৪ মিঃ হতে ১০.১১ মিঃ মধ্যে
২১/০৩/০৫	৭ই চৈত্র, সোমবার	আমলকীব্রত একাদশী	পরদিন ৬.০১ মিঃ হতে ১০.০৪ মিঃ মধ্যে
০৫/০৪/০৫	২২শে চৈত্র, মঙ্গলবার	পাপমোচনী একাদশী	পরদিন ৫.৪৬ মিঃ হতে ৮.১৮ মিঃ মধ্যে
২০/০৪/০৫	৭ই বৈশাখ, বুধবার	কামদা একাদশী	পরদিন ৫.৩২ মিঃ হতে ৯.৪৯ মিঃ মধ্যে
০৪/০৫/০৫	২১শে বৈশাখ, বুধবার	বরুথিনী একাদশী	পরদিন ৫.২২ মিঃ হতে ৯.৪৪ মিঃ মধ্যে
২০/০৫/০৫	৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার	মোহিনী একাদশী	পরদিন ৫.১৪ মিঃ হতে ৭.১৯ মিঃ মধ্যে
০২/০৬/০৫	১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার	অপরা একাদশী	পরদিন ৮.০০ মিঃ হতে ০৯.৪১ মিঃ মধ্যে
১৮/০৬/০৫	৪ঠা আষাঢ়, শনিবার	পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী	পরদিন ৫.১২ মিঃ হতে ০৯.৪৪ মিঃ মধ্যে
০২/০৭/০৫	১৮ই আষাঢ়, শনিবার	যোগিনী একাদশী	পরদিন ৫.১৬ মিঃ হতে ৯.৪৭ মিঃ মধ্যে
১৮/০৭/০৫	৩রা শ্রাবণ, সোমবার	শয়ন একাদশী (ত্রিস্পৃশ্যা)	পরদিন ৫.২২ মিঃ হতে ৯.৫০ মিঃ মধ্যে
৩১/০৭/০৫	১৬ই শ্রাবণ, রবিবার	কামিকা একাদশী	পরদিন ৬.৪৬ মিঃ হতে ৯.৫২ মিঃ মধ্যে
১৬/০৮/০৫	১লা ভাদ্র, মঙ্গলবার	পবিত্রারোপন একাদশী	পরদিন ৫.৩৫ মিঃ হতে ৯.৫৩ মিঃ মধ্যে
৩০/০৮/০৫	১৫ই ভাদ্র, মঙ্গলবার	অন্নদা একাদশী	পরদিন ৫.৪০ মিঃ হতে ৯.৫২ মিঃ মধ্যে
১৪/০৯/০৫	৩০শে ভাদ্র, বুধবার	পার্শ্বৈকাদশী	পরদিন ৫.৪৫ মিঃ হতে ৯.৫১ মিঃ মধ্যে
২৯/০৯/০৫	১৪ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার	ইন্দিরা একাদশী	পরদিন ৫.৫০ মিঃ হতে ৯.৪৯ মিঃ মধ্যে
১৪/১০/০৫	২৯শে আশ্বিন, শুক্রবার	পাশাঙ্কুশা একাদশী	পরদিন ৫.৫৬ মিঃ হতে ৯.৪৮ মিঃ মধ্যে
২৮/১০/০৫	১৩ই কার্তিক, শুক্রবার	রমা একাদশী	পরদিন ৬.০৩ মিঃ হতে ৯.৪৯ মিঃ মধ্যে
১২/১১/০৫	২৮শে কার্তিক, শনিবার	উত্থান একাদশী (ত্রিস্পৃশ্যা)	পরদিন ৬.১২ মিঃ হতে ৯.৫২ মিঃ মধ্যে
২৭/১১/০৫	১৩ই অগ্রহায়ন, রবিবার	উৎপন্না একাদশী	পরদিন ৬.২২ মিঃ হতে ৯.৫৮ মিঃ মধ্যে
১১/১২/০৫	২৭শে অগ্রহায়ন, রবিবার	মোক্ষদা একাদশী	পরদিন ৬.৩১ মিঃ হতে ১০.০৫ মিঃ মধ্যে
২৭/১২/০৫	১৩ই পৌষ, মঙ্গলবার	সফলা একাদশী	পরদিন ৬.৩৯ মিঃ হতে ১০.১৩ মিঃ মধ্যে

ইসকনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'অমৃতের সন্ধানে' পত্রিকাটি নিজে পড়ুন এবং অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন ॥

উন্নতি সাধন

১৯৭৫ সালের ১২ জুলাই ফিলাডেলফিয়া নগরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ

স এবং বর্তমানোহজ্ঞো মৃত্যুকাল উপস্থিতে।
মতিং চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে ॥
(ভাগঃ ৬/১/২৭)

"যখন মূর্খ অজামিলের কাছে মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, সে একান্তভাবে তার পুত্র নারায়ণের কথা স্মরণ করেছিল।"

জাগতিক জীবনে প্রত্যেকেই কোন না কোন অবস্থার মধ্যে অবস্থান করছে। আমি কোন একটি চেতনায় অবস্থান করছি, আবার আপনি কোন একটি চেতনায় অবস্থান করছেন। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুযায়ী জীবন সম্বন্ধে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা এবং ভিন্ন ভিন্ন চেতনা রয়েছে। সেটিই হচ্ছে জাগতিক জীবন।

জড়বাদীরা সাধারণত মনে করে যে এই জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় তর্পণ করা। সকলেই ভাবছে, "আমি এইভাবে বাঁচব ; আমি এইভাবে অর্থ উপার্জন করব ; আমি এইভাবে ভোগ করব।" ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টির জন্য প্রত্যেকেরই একটি কার্যক্রম রয়েছে।

অতএব, অজামিলেরও সেরকম একটি কার্যক্রম ছিল। সেটি কি ? যেহেতু সে তার কনিষ্ঠ সন্তানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিল, তাই তার সার্বিক মনোযোগটি ছিল কিভাবে সেই শিশু চলাফেরা করছে, কিভাবে সে খাচ্ছে, সে কথা বলছে–এসবের উপর। কখনও কখনও অজামিল তাকে ডাকতো, কখনও কখনও তাকে খাইয়ে দিত... অজামিলের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে তার সন্তানের ক্রিয়াকলাপের উপর মগ্ন ছিল।

কেবল অজামিলই নয়, প্রকৃতপক্ষে সকলেই কোন না কোন ধরনের চেতনায় মগ্ন রয়েছে এবং সেই চেতনার কারণটি কি ? কিভাবে তা বিকাশ লাভ করে ? পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, গভীর স্নেহবশত (স্নেহযন্ত্রিতঃ) অজামিল তার পুত্রের কার্য-কলাপের উপর মগ্ন ছিল। 'স্নেহ' অর্থ হচ্ছে অনুরাগ বা আবেগ এবং 'যন্ত্রিতঃ' মানে হচ্ছে একটি যন্ত্র। সুতরাং সকলেই এই স্নেহ-যন্ত্রদ্বারা প্রভাবিত। এই দেহটি হচ্ছে প্রকৃতিদ্বারা চালিত একটি যন্ত্র এবং এর পরিচালন নির্দেশ আসছে পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে। আমরা যে ধরনের ভোগ করতে চাই, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সেই ধরনের দেহ বা 'যন্ত্র' প্রদান করেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–আমেরিকায় আপনাদের বিভিন্ন ধরনের মোটর গাড়ি রয়েছে। কেউ বুইক (Buick) গাড়ি চায়, অন্য কেউ শেভ্রোলেট (Chevrolet) চায় আবার কেউ বা ফোর্ড (Ford) গাড়ি চায়। এবং এই সমস্ত গাড়িগুলি কিনবার জন্যই তৈরি হয়েছে। তেমনি আমাদের দেহটিও গাড়ির মত। কোন দেহ 'ফোর্ড' গাড়ি, কোন দেহ 'শেভ্রোলেট' গাড়ি এবং কোন দেহ 'বুইক' গাড়ি। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সবাইকে কোন না কোনভাবে ভোগ করার সুযোগ

প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "ও, এই ধরনের গাড়ি বা দেহ চাও ? বসে পড় এবং ভোগ কর।" এই হচ্ছে আমাদের জড় জাগতিক অবস্থা।

আমাদের দেহের পরিবর্তনের পর আমরা ভুলে যাই যে, আমরা কি চেয়েছিলাম এবং কেন আমাদের এই বর্তমান দেহটি ? কিন্তু কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়েই অবস্থান করছেন, তাই তিনি ভোলেন না। আমরা যা চাই, কৃষ্ণ আমাদের তাই প্রদান করেন। কৃষ্ণ এতই দয়ালু। যদি কেউ এমন একটি দেহ আকাঙ্ক্ষা করে, যার মাধ্যমে সে সমস্ত রকম অপবিত্র জিনিষ খেতে পারবে, শ্রীকৃষ্ণ তাকে একটি শূকরের দেহ দান করেন। তখন সে বিষ্ঠাও ভক্ষণ করতে পারে। এবং যদি কেউ এমন দেহ পেতে চায়, যার ফলে সে কৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করতে পারবে, তখন সে সেই রকম দেহ লাভ করে। এখন, আপনি কৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করতে পারা যায় সেরকম দেহ লাভ করবেন, না মলমূত্র ভক্ষণ করতে পারা যায়, এরকম একটি দেহ লাভ করবেন? এটি আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। এই মানব জীবনেই আমাদের এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হবে।

আপনি বলতে পারেন যে, "আমি পরবর্তী জীবন বিশ্বাস করি না।" কিন্তু প্রকৃতির আইন তার কাজ করে যাবে। **কর্মণাদৈবনেত্রেন**– আপনি আপনার পরবর্তী দেহটি প্রস্তুত করছেন আপনার এই জীবনের কর্ম অনুসারে। মৃত্যুর পর–এই দেহটির নিবৃত্তির পর তৎক্ষণাৎ আপনি আরেকটি দেহ প্রাপ্ত হবেন। কেননা ইতিমধ্যেই আপনার কাজের মাধ্যমে ঠিক হয়ে গিয়েছে, আপনি কি ধরনের দেহ প্রাপ্ত হবেন।

অজামিল খুব সুন্দরভাবে তার শিশুর যত্ন নিয়েছিলেন। তার মন সম্পূর্ণভাবে কেবল শিশুতেই সন্নিবিষ্ট ছিল। তাই তাকে মূঢ় অর্থাৎ মূর্খ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অজামিলের মত আমরাও ভুলে যাচ্ছি যে, একটি দিন আসছে, যাকে বলা হয় 'মৃত্যু-কাল'। আমরা সেটি ভুলে যাই। এটি হচ্ছে আমাদের অপূর্ণতা।

একজন স্নেহশীল পিতারূপে অজামিল এতই ব্যস্ত ছিলেন যে তিনি তার উপস্থিত মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আমরা সকলেই অজামিলের মত। আমাদের কত জনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। তা সহানুভূতিশীল সহৃদয়ই হোক আর ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুই হোক-এই সম্পর্কগুলিতে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে আমরা ভুলে যাই যে সম্মুখে মৃত্যু রয়েছে।

তাই, জাগতিক মানুষদের মূঢ় বলা হয়। মূঢ় অর্থ হচ্ছে মূর্খ, গাধা। যে জানে না তার প্রকৃত লাভ বা স্বার্থটি কি ! ভারতে আমরা মাঝে মাঝে প্রায় এক টন কাপড় বয়ে নিয়ে যাওয়া ধোপার গাধা দেখতে পাই। গাধাটি বোঝা ছাড়াই হাঁটতে পারে। কিন্তু তবু তাকে বোঝা বহন করতে হচ্ছে। সে ভাবে না, "আমি যে আমার পিঠে এত এত কাপড় বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এতে আমার কি লাভ হচ্ছে ? একটা কাপড়ও তো আমার নয়।" না, একথা না ভেবে সে বরং ভাবে, "এত এত কাপড় বয়ে নিয়ে যাওয়াটাই আমার কর্তব্য।" কেন এটি তার কর্তব্য ? কারণ ধোপা তাকে ঘাস দিচ্ছে। তার একথা ভাবার মত জ্ঞান নেই, 'ঘাস'তো আমি যে কোন স্থানেই পেতে পারি। কেন আমাকে তাহলে এই কর্তব্যটি গ্রহণ করতে হবে?" এটিই হচ্ছে গাধার মানসিকতা।

প্রত্যেকেই তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে ব্যগ্র। কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ গৃহী, কেউ বা আরো অন্য কিছু। কিন্তু যেহেতু তারা সকলেই কতকগুলি মিথ্যা কর্তব্য গ্রহণ করে তা পালন করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করছে, তাই তারা সকলেই হচ্ছে গাধা। তারা তাদের প্রকৃত কর্তব্য ভুলে গিয়েছে।

আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, মৃত্যু আসবে এবং তা কখনও আমাদের এড়িয়ে যাবে না। (যখন কোন কিছু নিশ্চিত হয়, তখন আমরা বলে থাকি যে তা, "মৃত্যুর মতই নিশ্চিত।") তাই মৃত্যু আসার আগেই আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে, যাতে আমরা চিন্ময় লোক গোলোক-বৃন্দাবনে স্থান লাভ করে কৃষ্ণের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করতে পারি। সেটিই আমাদের প্রকৃত কর্তব্য।

কিন্তু সাধারণ মানুষেরা জানে না যে আমরা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলেই জীবনের এই বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু সে কথা ভুলে গিয়েছি। আমরা মনে করছি – আমরা আমেরিকা অথবা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি মায়া।

কেউ তার দেশের প্রতি আগ্রহী, কেউ তার সমাজের অথবা পরিবারের প্রতি আগ্রহী এবং এই সমস্ত বিষয়ে আমরা অসংখ্য কর্তব্যের সৃষ্টি করেছি। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে – **ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্** – মূর্খেরা জানে না তাদের প্রকৃত স্বার্থ কি। যেহেতু তারা তাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাই তারা হচ্ছে 'দুরাশয়', অর্থাৎ তারা এমন কিছুর আশা করছে, যা কখনই পূর্ণ হবে না। তারা এই জড়-জগতে সুখী হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা জানে না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই জড় জগতে থেকে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সুখের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই জায়গাটি হচ্ছে **'দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্'**– দুঃখে পূর্ণ এবং অস্থায়ী। এই জড় জগতে আমরা একের পর এক দেহ পরিবর্তন করতে বাধ্য। এটিই হচ্ছে দুর্দশা। আমি হচ্ছি স্থায়ী (ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে), তাহলে কেন আমাকে আমার দেহ পরিবর্তন করতে হবে ? আমাদের এই প্রশ্ন করা উচিত।

এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আমাদের যথার্থ উৎস থেকে জ্ঞান লাভ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন যথার্থ পরম-উৎস, ব্যক্তিগতভাবে আমাদেরকে ভগবদ্গীতায় সেই জ্ঞানই প্রদান করেছেন। আমরা যদি সেই জ্ঞান গ্রহণ না করার মত এতই দুর্ভাগা হই–আমরা যদি বানিয়ে বানিয়ে আমাদের নিজস্ব ধারণার সৃষ্টি করি, তাহলে বুঝতে হবে যে, আমরা হচ্ছি 'দুরাশয়'–অসম্ভবে আশাবাদী। আমরা মনে করছি, "আমি এইভাবে সুখী হব, আমি ঐভাবে সুখী হব।" না। আপনি আপনার স্বীয় আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কখনও সুখী হতে পারেন না। এটিই হচ্ছে প্রকৃত নির্দেশ।

ধরা যাক্ কোন একজন পাগল ছেলে তার পিতাকে পরিত্যাগ করেছে। তার পিতা একজন ধনী ব্যক্তি এবং সেখানে ছেলেটির সবরকম সুবিধাই রয়েছে, কিন্তু তবুও ছেলেটি হিপি হয়ে গেল। এই জগতে আমরাও তেমনি। আমাদের পিতা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং আমরা তার ধামে কোন রকম উদ্বেগ ও অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারি। অথচ আমরা ঠিক করেছি যে, আমরা এই জড় জগতেই বাস করব। এটা হচ্ছে গাধার মানসিকতা-মূঢ়। আমরা জানি না যে, আমাদের প্রকৃত ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভ কোনটি এবং আমরা আশাতিরিক্তভাবে আশা করছি যে-"আমি এইভাবে সুখী হব, আমি ঐভাবে সুখী হব।"

কখনো কখনো ধোপারা গাধার পিঠে চড়ে এক আঁটি ঘাস গাধার মুখের সামনে ঝুলিয়ে রাখে। গাধাটি ঘাস খেতে চায়, কিন্তু সে যতই এগোয় ঘাসও তত এগিয়ে চলে। গাধাটি ভাবে, "আর এক পদক্ষেপ মাত্র, তাহলেই আমি ঘাস পেয়ে যাব।" যেহেতু সে হচ্ছে একটি গাধা, তাই সে জানে না যে, ঘাসের আঁটিটি এমনভাবে তার মুখের সামনে অবস্থান করছে– যার ফলে সে লক্ষ লক্ষ বৎসর হেঁটে গেলেও, ঘাস সে পাবে না। তেমনই জাগতিক মানুষেরা একথা কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারে না, "আমরা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে এই জড় জগতে সুখী হবার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমি কিছুতেই সুখী হতে পারছি না।"

সুতরাং যিনি তা যথাযথ-রূপে অবগত রয়েছেন, সেইরকম গুরুদেবের কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীগুরুদেবকে এইভাবে বন্দনা করা হয়-

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

"অজ্ঞতার গভীরতম অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল, কিন্তু আমার গুরুদেব সেই অন্ধকার থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন, জ্ঞানের অঞ্জন পরিয়ে দিয়ে তিনি আমার চক্ষু উন্মীলিত করলেন। সেই অপার করুণাময় গুরুদেবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

অন্ধ রাজনীতিবিদরা আপনাদের সুখ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। "আমাকে ভোট দাও, আমি তোমাদের স্বর্গ এনে দেব। যখনই আমি রাষ্ট্রনায়ক হব, আমি তোমাদের এই..........এই...........সুবিধা দেব।" এভাবে আপনারা মিঃ নিক্সনকে নির্বাচিত করলেন এবং অবশেষে হতাশ হলেন। এরপর আপনারা বললেন "নিক্সন বেরিয়ে যাও" এবং আরেকজন মূর্খকে গ্রহণ করলেন। এইভাবে আপনারা কখনই, কিভাবে প্রকৃত সুখ লাভ করা যায় তার যথার্থ তথ্য লাভ করতে পারবেন না।

আমি কোথা থেকে প্রকৃত তথ্য পেতে পারি? বেদে বলা হয়েছে, **তদ্বিজ্ঞাৎ নার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছে** - "প্রকৃত তথ্য জানতে হলে গুরুর কাছে যেতে হবে।" গুরু কে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা"- অর্থাৎ আমার আজ্ঞায় গুরু হও। অতএব গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ পালন করেন, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও নির্দেশ পালন ব্যতীত কেউই গুরু হতে পারে না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধারণ মানুষেরা এই কথা জানে না। তাই যে কেউ এসে বলতে পারে, "আমি হচ্ছি গুরু"। আপনি কিভাবে গুরু হলেন? - "ওঃ, আমি হচ্ছি স্বয়ং সম্পূর্ণ। আমার কোন গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি।" মূর্খটি জানে না পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং শাস্ত্রের অনুগমন ভিন্ন কেউই গুরু হতে পারে না। ফলে মানুষেরা অসংখ্য ভণ্ড-গুরু গ্রহণ করছে। এরকমই চলছে।

আপনাদের জানা উচিত যে, গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করেন। এটিই হচ্ছে গুরু'র সহজ সংজ্ঞা। সে ভণ্ড, যে কেবল কতগুলি ধারণার সৃষ্টি করছে, সে কখনই গুরু হতে পারে না। অবিলম্বে তাকে দূর করে দিন। এক্ষুণি। সে গুরু নয়-সে হচ্ছে ভন্ড। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, গুরু হচ্ছেন ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক বা দাস। তাই, যে নিজেকে গুরু বলে পরিচয় দিচ্ছে, তাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করুন, "আপনি কি ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক?" যদি সে বলে, "না, আমিই হচ্ছি ভগবান" তাহলে তৎক্ষণাৎ তার মুখে লাথি মেরে তাকে দূর করে দিন। -"তুমি ভণ্ড হয়ে আমাদের প্রতারনা করতে এসেছ?"

বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে – **তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ**-"আপনি যদি পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে অবগত হতে চান, আপনাকে অবশ্যই একজন গুরু'র শরণাগত হতে হবে।" কেউ যদি গুরুহীনভাবে তার নিজের খুশিমত জীবনধারার সৃষ্টি করে, তাহলে সে একজন মূর্খ-মূঢ়। অজামিলের অবস্থাটিও ছিল তেমনি। সে ভাবছিল, "আমি কত স্নেহশীল পিতা! আমি আমার কনিষ্ঠ সন্তানের যত্ন নিচ্ছি। আমি তাকে খাওয়াচ্ছি। আমি তাকে লালন পালন করছি। আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সৎ পিতা।"

কিন্তু এখানে শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলকে মূঢ় বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেন? **ন বেদাগতমন্তকম্** – কেননা তার মৃত্যুর উপস্থিতি সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। সে ভাবেনি, "পশ্চাতে মৃত্যু অপেক্ষা করছে এবং সে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।" কিন্তু তথাকথিত সন্তান, সমাজ এবং পরিবারের প্রতি অজামিলের স্নেহ– কিভাবে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে? একথার উত্তর সে দিতে পারে নি।

সুতরাং, আমাদের অবশ্যই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে, মৃত্যু শিয়রে রয়েছে এবং যে কোন মুহূর্তে সে আমাদের ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাবে। সেটিই বাস্তব সত্য। আপনি একশত বৎসর বাঁচবেন, এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি? না। আপনি রাস্তায় বের হলে তৎক্ষণাৎ আপনার মৃত্যু হতে পারে, আপনার হৃদরোগ হতে পারে, মোটর গাড়ির দুর্ঘটনা হতে পারে....কত রকমের বিপদ রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকাটাই বিস্ময়কর। মৃত্যু বিস্ময়কর নয়। কেননা মৃত্যু আপনার হবেই। যখনই আপনার জন্ম হয়, তখনই আপনার মৃত্যু শুরু হয়। কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারে, "এই শিশুটি কখন জন্মগ্রহণ করেছে?" এবং আপনি হয়ত বলতে পারেন, "এক সপ্তাহ আগে।" অর্থাৎ শিশুটি এক সপ্তাহ আগে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এটা আশ্চর্যের যে, সে তখনও বেঁচে আছে-তার মৃত্যু হয় নি। মৃত্যুতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা সেটা নিশ্চিত। তা এক সপ্তাহ পরেও হতে পারে, আবার ১০০ বৎসর পরেও হতে পারে। তাই আমাদের অবশিষ্ট সময়কে আমাদের জীবনের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত। যাতে আমাদের আর পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করতে না হয়।

মানুষ যদি যথার্থ গুরুর শরণাগত না হয়, তাহলে কিভাবে তারা চিন্ময়-জ্ঞান উপলব্ধি করবে ? তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, **তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ**– আপনি যদি আপনার জীবনের প্রকৃত সমস্যাটি জানতে চান, কৃষ্ণভাবনাময় হতে উৎসাহী হন এবং কিভাবে আপনার স্বীয় নিত্য ধাম, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারবেন – একথা যদি জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সদ্‌গুরু কে ? সেটি আমরা বর্ণনা করেছি যে, যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ পালন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনিই সদ্‌গুরু। প্রকৃত গুরু কখনও নিজের মনোধর্মপ্রসূত ধারণা সৃষ্টি করেন না। "আমাকে টাকা দাও আর এগুলি করে সুখী হও"–প্রকৃত গুরু কখনও এই শিক্ষা দেন না। এটা কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের পন্থা।

সকলেই অজামিলের মত নিজস্ব ধারণার সৃষ্টি করে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। কেউ 'এটা'কে তার কর্তব্য মনে করছে আবার কেউ 'ওটা'কে তার কর্তব্য মনে করছে। কিন্তু তারা সকলেই মূর্খ। তাই আপনাকে গুরুদেবের কাছ থেকে জানতে হবে-আপনার প্রকৃত কর্তব্য কি ?

তোমরা প্রতিদিনই গান করছ–"**গুরু মুখপদ্ম বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, আর না করিও মনে আশা।**" এটিই জীবন। তোমরা যথার্থ গুরু গ্রহণ করেছ এবং তার নির্দেশ পালন করছ। তাই তোমাদের জীবন সার্থক হচ্ছে। 'আর না করিও মনে আশা'। এবং তোমরা আর কিছু আশা কর না। তোমরাতো ঐ গানটি প্রতিদিনই গাও। কিন্তু তোমরা কি তার অর্থ বোঝ ? না কি অর্থ না বুঝেই গানটি এমনি গাইছ ? এর অর্থ কি ? কে বলতে পারে ?

ভক্ত ঃ আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই যে আমার শ্রীগুরুমুখপদ্ম নিঃসৃত বাক্যধারা আমার হৃদয় শুদ্ধতা লাভ করুক। এছাড়া আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। গুরু মুখপদ্ম বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য। চিত্ত মানে হচ্ছে 'চেতনা' বা 'মন'। শিষ্যের অবশ্যই চিন্তা করা উচিত, "আমার গুরুদেব আমাকে যা নির্দেশ করবেন, আমি তাই পালন করব।" আমার গুরু–মহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, আমাকে পাশ্চাত্যে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, এতে আমার কোন গৌরব নেই। কিন্তু উপদেশার্থে আমি তোমাদের বলতে পারি যে, সেই নির্দেশ আমি পালন করেছি। তাই যেটুকু সামান্য সফলতা, তোমরা করার জন্য। একা আমার কোন ক্ষমতাই নেই। কিন্তু আমি আমার গুরুমুখপদ্ম বাক্যকে আমার সমগ্র জীবনের আত্মস্বরূপ-রূপে গ্রহণ করেছি। সেটিই সত্য।

প্রত্যেকেরই এটি ক... উচিত। কিন্তু তুমি যদি কোন পরিবর্ধন ও পরিমার্জন ক..., তুমি শেষ হয়ে যাবে। কোন পরিবর্ধন ও পরিমার্জন নয়। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ত সেবক–গুরুদেবের কাছে তোমাকে প্রণিপাত করতে হবে এবং কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হবে, সে বিষয়ে তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই তুমি সফল হবে। তুমি যদি মনে কর-"আমি গুরুর চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান, আমি পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে পারি"- তবে তুমি শেষ হয়ে যাবে।

এরপর কি আছে, গাও।

ভক্ত ঃ **শ্রীগুরু চরণে রতি, এই সে উত্তম গতি।**

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তুমি যদি যথার্থ উন্নতি চাও, তবে শ্রীগুরু পাদপদ্মে তোমাকে দৃঢ়রূপে প্রত্যয়ী হতে হবে। তারপর ?

ভক্ত ঃ **যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা।**

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হয়। সমগ্র বৈষ্ণব দর্শনেই তুমি এই নির্দেশ প্রাপ্ত হবে। তাই আমরা যদি সদ্‌গুরুর সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করতে না পারি, তাহলে আমরা মূঢ় বা গাধাই থেকে যাব।

আজ আমরা অজামিল সম্বন্ধীয় একটি শ্লোক পাঠ করছিলাম। শ্রীল ব্যাসদেব এখানে বলেছেন যে, সেই মুর্খটি তার পুত্র নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত ছিল। অজামিল, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে আহ্বান করেনি। সে তার ছেলেকে ডাকছিল ঃ "নারায়ণ, এদিকে এস। নারায়ণ, এটা নাও।" কিন্তু তবু শ্রীকৃষ্ণ এত কৃপাময় যে তিনি অজামিলকে তাঁর নারায়ণ নাম গ্রহণকারী বলে গ্রহণ করলেন। অজামিল কখনও ভাবেনি, "আমি ভগবান নারায়ণের কাছে যাচ্ছি।" স্নেহের বশবর্তী হয়ে সে কেবল তার ছেলেকে চাইছিল। কিন্তু তার সুকৃতি প্রভাবে অজামিল নারায়ণের পবিত্র নাম – কীর্তনের সুযোগ পেয়েছিল।

অজামিলকে মূঢ় এবং অজ্ঞ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'মূঢ়' অর্থ হচ্ছে 'শঠ' বা 'ভণ্ড' এবং 'অজ্ঞ' অর্থ হচ্ছে 'অশিক্ষিত'। শুধু অজামিলই নয় এই জড় জগতের সকলেই 'ভণ্ড' এবং 'অশিক্ষিত'। কেননা তাদের যে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। যখন তাদের পরিকল্পনা, সম্পত্তি সমস্ত কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, সে সম্বন্ধে তারা সতর্ক নয়। তারা তা জানে না অথবা তারা এসব বিষয়ে চিন্তা করতে যত্নবান নয়। সুতরাং প্রত্যেকেই মূঢ় এবং অজ্ঞ।

এখন, মৃত্যুকালে অজামিল যখন তার ছেলের কথা ভাবছিল, সৌভাগ্যক্রমে তার ছেলের নামটি ছিল নারায়ণ। তাই অজামিল উদ্ধার পেয়ে গেল। কিন্তু ধরা যাক, তেমনিভাবে আমি আমার কুকুরের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। তাহলে আমার অবস্থাটি কি হবে ? স্বভাবতই মৃত্যুর সময় আমি আমার কুকুরের কথা ভাববো এবং অবিলম্বে আমি একটি কুকুরের দেহ প্রাপ্ত হব। সেটিই প্রকৃতির আইন ঃ **যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ তং তমেবৈতি**–"মৃত্যুর সময় তুমি যা চিন্তা করবে, তার দ্বারা তোমার পরবর্তী দেহ গঠিত হবে।" অজামিল তার ছেলের প্রতি অতিশয় স্নেহপ্রবণ ছিল, তাই মৃত্যুর সময় সে তার কথা ভেবেছিল। তেমনি, তুমি যদি তোমার কুকুর বা অন্য কিছুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হও, মৃত্যুর সময় তুমি তারই চিন্তা করবে। অতএব, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ অনুশীলন কর, যাতে মৃত্যুকালে তুমি শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করতে পার এবং তোমার এই জীবনকে সার্থক করতে পার।

অসংখ্য ধন্যবাদ।

নৈমিত্তিক ধর্ম অসম্পূর্ণ, হেয়, মিশ্র ও অস্থায়ী

– সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম ও তাঁহার কর্মত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ-এ সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম। এই সমস্ত কর্ম ধর্মশাস্ত্রে প্রশস্ত ও অধিকারভেদে নিতান্ত উপাদেয়, তথাপি নিত্যকর্মের নিকট ইহার কোন সম্মান নাই, যথা (ভাঃ ৭/৯/১০)-

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচঃ বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং
পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥"

কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ, দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, কেননা, আমি মনে করি, যাঁর কৃষ্ণেতে অর্পিত মন, বাক্য, চেষ্টা ও অর্থ, তিনি স্বীয় কুলের সহিত নিজ প্রাণকে পবিত্র করেন, কিন্তু বহুমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করতে পারে না।

সত্য, দম, তপঃ, অমাৎসর্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বেদশ্রবণ ও ব্রত-এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ধর্ম। এবম্ভূত-দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জগতে পূজনীয় বটে, কিন্তু যদি ঐসকল-গুণ-যুক্ত হয়েও কৃষ্ণভক্তি-শূণ্য হন, তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য এই যে, চণ্ডালবংশে জন্মলাভ করে সাধুসঙ্গরূপ সংস্কার দ্বারা যিনি জীবের নিত্যধর্মরূপ চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত, তিনি ব্রাহ্মণবংশে জাত, শুদ্ধচিদনুশীলনরূপ নিত্যধর্মানুশীলনে বিরত, নৈমিত্তিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

জগতে মানব দুই প্রকার অর্থাৎ উদিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক। অনুদিত বিবেক মানবই সংসারকে প্রায় পরিপূর্ণ করে আছেন। উদিত-বিবেক বিরল। অনুদিত বিবেক নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তদ্বর্ণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম সকল ব্যাপারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

উদিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তর 'বৈষ্ণব'।

বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার ও অনুদিত-বিবেক ব্যক্তিগণের ব্যবহার পরস্পর অবশ্য পৃথক্ হবে। পৃথক্ হলেও বৈষ্ণব-ব্যবহার, অনুদিত-বিবেক পুরুষদিগের শাসন জন্য নির্মিত স্মার্ত-বিধানের তাৎপর্যবিরুদ্ধ নয়। শাস্ত্রতাৎপর্য সর্বত্রই এক। অনুদিত-বিবেক পুরুষেরা, শাস্ত্রের স্থূল বাক্যের একদেশে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য আছেন। উদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের তাৎপর্যকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন। ক্রিয়া-ভেদেও তাৎপর্য ভেদ নাই। অনধিকারীর চক্ষে উদিত-বিবেক পুরুষদিগের ব্যবহার সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলে বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ পৃথক্ ব্যবহারের মূল তাৎপর্য এক।

উদিত-বিবেক পুরুষদিগের চক্ষে সাধারণের জন্য নৈমিত্তিক-ধর্ম উপদেশ-যোগ্য; কিন্তু নৈমিত্তিক-ধর্ম বস্তুতঃ

অসম্পূর্ণ, হেয়, মিশ্র ও অচিরস্থায়ী।

নৈমিত্তিক-ধর্মে সাক্ষাৎ চিদনুশীলন নাই। চিদনুশীলনের অনুগত করে জড়ানুশীলনকে গ্রহণ করায়, তাহা কেবল চিদনুশীলনরূপে উপেয়-প্রাপ্তির উপায় হয়ে থাকে। উপায় উপেয়কে দিয়ে নিরস্ত হয়। অতএব উপায় কখনও সম্পূর্ণ নয়-উপেয় বস্তুর খণ্ডাবস্থা-মাত্র। অতএব নৈমিত্তিক-ধর্ম কখনই সম্পূর্ণ নয়। উদাহরণস্থল এই যে, ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনা তাঁহার অন্যান্য কর্মের ন্যায় ক্ষনিক ও বিধিসাধ্য। সহজ-প্রবৃত্তি হতে ঐ সকল কার্য হয় না। পরে বহুদিন বৈধ ব্যাপারে থাকতে থাকতে, যখন সাধুসঙ্গ-সংস্কার দ্বারা চিদনুশীলনরূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন কর্মাকারে আর সন্ধ্যাবন্দনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদনুশীলন। সন্ধ্যাবন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান কার্যের উপায় মাত্র। ইহা কখন সম্পূর্ণতত্ত্ব হয় না।

নৈমিত্তিক-ধর্ম সদুদ্দেশক বলে আদৃত হলেও উহা হেয়, মিশ্র। চিত্তত্ত্বই উপাদেয়। জড় ও জড়সঙ্গই জীবের পক্ষে হেয়! নৈমিত্তিক-ধর্মে অধিক জড়ত্ব আছে। আবার তাতে এত অবান্তর ফল আছে যে, জীব সেই সকল ক্ষুদ্র ফলে না পড়ে-থাকতে পারে না; যথা–ব্রাহ্মণের ঈশোপাসনা ভাল বটে, কিন্তু 'আমি ব্রাহ্মণ, অন্য জীব আমা অপেক্ষা হীন'–এরূপ মিথ্যা অহঙ্কার ব্রাহ্মণের উপাসনাকে হেয়ফলজনক করে তুলে। অষ্টাঙ্গযোগাদিতে 'বিভূতি'–নামক একটী অপকৃষ্ট ফল জীবের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। 'ভুক্তি', 'মুক্তি' এই দু'টি নৈমিত্তিক-ধর্মের অনিবার্য সহচরী। ইহাদের হাত হতে বাঁচতে পারলে তবে মূল উদ্দেশ্য যে চিদনুশীলন, তাহা হতে পারে। অতএব নৈমিত্তিক-ধর্মে জীবের পক্ষে হেয়ভাগ অধিক।

নৈমিত্তিক-ধর্ম অচিরস্থায়ী। নৈমিত্তিক ধর্ম জীবের সর্বাবস্থায় সর্বকালে থাকে না; যথা–ব্রাহ্মণের ব্রহ্মধর্ম ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম ইত্যাদি নৈমিত্তিক-ধর্ম, নিমিত্ত শেষ হলেই বিগত হয়। এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-জন্মের পর চণ্ডাল-জন্ম লাভ করলেন, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণবর্ণাগত নৈমিত্তিক-ধর্ম আর স্বধর্ম নয়। 'স্বধর্ম'-শব্দটিও এস্থলে ঔপচারিক। জন্মে জন্মে জীবের স্বধর্মের পরিবর্তন হয়, কিন্তু কোন জন্মেই জীবের নিত্যধর্মের পরিবর্তন হয় না। নিত্যধর্মই বস্তুতঃ জীবের স্বধর্ম; নৈমিত্তিক ধর্ম অচিরস্থায়ী।

তবে যদি বলেন, বৈষ্ণবধর্ম কি ? উত্তর–এই ধর্ম জীবের নিত্যধর্ম। বৈষ্ণব-জীব জড়মুক্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকারে কৃষ্ণপ্রেমের অনুশীলন করেন এবং জড়বদ্ধ অবস্থায় উদিত-বিবেক হয়ে জড় ও জড় সম্বন্ধের মধ্যে চিদনুশীলনের সমস্ত অনুকূলবিষয় আদরপূর্বক গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল সমস্তই বর্জন করেন। শাস্ত্রের বিধিনিষেধের বশীভূত হয়ে কার্য করে না। যে-বিধি যখন হরিভজনের অনুকূল, তখনই তাকে আদর করেন; যখন প্রতিকূল, তখনই তাকে অনাদর করেন। নিষেধসম্বন্ধেও বৈষ্ণবের ব্যবহার তদ্রূপ। বৈষ্ণব জগতের সার পদার্থ। বৈষ্ণবই জগতের বন্ধু। বৈষ্ণবই জগতের মঙ্গল। আজ এই বৈষ্ণবসভায় আমি বিনীতভাবে

আমার বক্তব্যসকল বললাম। আপনারা আমার সমস্ত দোষ মার্জনা করুন।

এই বলে বৈষ্ণবদাস যখন সাষ্টাঙ্গে বৈষ্ণবসভাকে প্রণাম করে একপার্শ্বে বসলেন, তখন বৈষ্ণবদিগের নয়নবারি প্রবলরূপে বইতে লাগল। সকলেই একবাক্যে ধন্য ধন্য বলে উঠলেন। গোদ্রুমের কুঞ্জ-সকলও চতুর্দিক হতে ধন্য ধন্য বলে উত্তর দিল।

জিজ্ঞাসু গায়ক ব্রাহ্মণটী বিচারের অনেক স্থলে নিগূঢ় সত্য দেখতে পেলেন। আবার কোন কোন স্থলে কিছু সন্দেহের বিষয়ও উপস্থিত হল। যাহা হউক, তাঁহার মনে বৈষ্ণবধর্মের শ্রদ্ধাবীজ একটু গাঢ় হয়ে উঠল। তিনি করজোড়পূর্বক বললেন, মহোদয়গণ, আমি বৈষ্ণব নই, কিন্তু হরিনাম শুনতে শুনতে বৈষ্ণব হয়েছি। আপনারা কৃপা করে যদি আমাকে কিছু কিছু শিক্ষা দেন, তাহা হলে আমার অনেকগুলি সন্দেহ দূর হয়।

শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় কৃপা করে বললেন,-আপনি সময়ে সময়ে শ্রীমান্ বৈষ্ণবদাসের সঙ্গ করবেন। ইনি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। বেদান্তশাস্ত্র গাঢ়রূপে পাঠ করে সন্ন্যাসগ্রহণ করে বারাণসীতে ছিলেন; আমাদের প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অসীম কৃপা প্রকাশ করে ইহাকে এই শ্রীনবদ্বীপে আকর্ষন করেছেন। এখন ইঁনি বৈষ্ণবতত্ত্বে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ। শ্রীহরিনামে ইঁহার গাঢ় প্রীতি জন্মেছে।

জিজ্ঞাসু মহাশয়ের নাম শ্রীকালিদাস লাহিড়ী। তিনি বাবাজী মহাশয়ের ঐ বাক্য শ্রবণ করে বৈষ্ণবদাসকে মনে মনে গুরু বলে বরণ করলেন। তাঁহার মনে এই হল যে, এ ব্যক্তির ব্রাহ্মণকূলে জন্ম এবং ইনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণকে উপদেশ করবার যোগ্য, আবার বৈষ্ণব-তত্ত্বে ইহার বিশেষ প্রবেশ দেখছি, তাতে বৈষ্ণবধর্মের অনেক কথাই ইহার নিকট জানা যাবে। এই মনে করে লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্ণবদাসের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বললেন,-"মহোদয়, আপনি আমাকে কৃপা করবেন।" বৈষ্ণবদাস তাঁকে দণ্ডবৎ প্রনাম করে উত্তর দিলেন-"আপনিও আমাকে কৃপা করলেই আমি চরিতার্থ হই।"

সে দিবস প্রায় সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হল। তখন সকলে নিজ স্থানে গমন করলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের স্থানটি পল্লীর মধ্যে একটি গোপনীয় স্থান; সেটীও একটী কুঞ্জ। মধ্যস্থলে মাধবীমণ্ডপ ও বৃন্দাদেবীর মঞ্চ। দু'দিকে দু'খানি ঘর। উঠানটি চিতের বেড়ায় বেষ্টিত। বেলগাছ নিমগাছ ও আর কয়েকটী ফল ও ফুলের গাছ তথায় শোভা পায়। সেই কুঞ্জের অধিকারী মাধবদাস বাবাজী। বাবাজীটী প্রথমে ভালই ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে তাঁর বৈষ্ণবতার বিশেষ হানি হয়েছে। যোষিৎসঙ্গদোষে দুষ্ট হয়ে ভজনাদি খর্ব হয়ে পড়েছে। অর্থাভাববশতঃ নিজের ব্যয় ভালরূপ চলে না। তিনি অনেক স্থান হতে ভিক্ষা করেন এবং একখানি গৃহ ভাড়া দেন। সেই গৃহখানিতে লাহিড়ী মহাশয় বাসা করেছেন।

অর্ধরাত্রে লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা ভঙ্গ হলো। তিনি বৈষ্ণব দাস বাবাজীর বক্তৃতার সারার্থ মনে মনে বিচার করছিলেন। প্রাঙ্গণে এই সময়ে একটি শব্দ হল। বাহির হয়ে দেখেন, মাধব দাস বাবাজী একটী স্ত্রীলোকের সহিত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কথোপকথন করছেন। তাঁকে দেখামাত্র স্ত্রীলোকটি অদর্শন হল, লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট লজ্জিত হয়ে মাধবদাস নিস্তব্ধভাবে দাঁড়ালেন।

লাহিড়ী মহাশয় বললেন,-বাবাজী, এ কি ব্যাপার? মাধবদাস সজল-নয়নে বললেন-আমার মাথা! আর কি বলব? হায়! আমি কি ছিলাম, আর কি হলাম! পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কত শ্রদ্ধা করতেন! এখন তাঁহার নিকট যেতে আমার লজ্জা হয়।

লাহিড়ী মহাশয় বললেন,-কথাটা স্পষ্ট করে বললে আমরা বুঝতে পারি।

মাধবদাস বললেন,-যে স্ত্রীলোকটাকে দেখলেন, উনি আমার পূর্বাশ্রমে বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। আমি ভেকগ্রহণ করলে উনি কিছুদিন পরে শ্রীপাট শান্তিপুরে এসে গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর বেঁধে বাস করলেন। এরূপে অনেকদিন গেল। আমি শ্রীপাট শান্তিপুরে গিয়া গঙ্গাতীরে তাঁকে দেখে বললাম,-তুমি কেন গৃহত্যাগ করলে? উনি আমাকে বুঝালেন যে, সংসার আর ভাল লাগে না, আপনার চরণসেবা হতে বঞ্চিত হয়ে আমি তীর্থবাস করছি, ভিক্ষা শিক্ষা করে খাব। আমি তাকে আর কিছু না বলে শ্রীগোদ্রুমে আসলাম। উনি ক্রমে ক্রমে গোদ্রুমে এসে একটি সদগোপের বাটীতে রইলেন। প্রত্যহই কোন স্থানে না কোন স্থানে উহার সহিত দেখা হয়। আমি যত উহার হাত ছাড়াতে ইচ্ছা করি, উনি ততই ঘনিষ্ঠতা করতে লাগলেন। উনি এখন একটী আশ্রম করেছেন। অধিক রাত্রে এসে আমার সর্বনাশ করবার যত্ন করেন। আমার অযশ সর্বত্র ঘোষিত হচ্ছে। উহার সঙ্গে আমার ভজনাদি অত্যন্ত খর্ব হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসগণের মধ্যে আমি কুলাঙ্গার। ছোট হরিদাসের দণ্ড হবার পর, আমিই এক দণ্ডযোগ্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছি। শ্রীগোদ্রুমস্থ বাবাজীগণ কৃপা করে আজও আমাকে দণ্ড করেন নাই, কিন্তু আর শ্রদ্ধা করেন না।

লাহিড়ী মহাশয় ঐ কথা শ্রবণ করে বললেন,-মাধবদাস বাবাজী, সাবধান হউন। এই কথা বলে তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। বাবাজীও নিজ গদিতে গিয়ে বসলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা হল না। মনে মনে বললেন, মাধবদাস বাবাজী ত' বান্তাশী হয়ে অধঃপথে গেলেন। আমার এখানে থাকা উচিত হয় না। কেননা, সঙ্গদোষ না হলেও বিশেষ নিন্দা হবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধাসহকারে আর আমাকে শিক্ষা দিবেন না।

প্রাতঃকালেই তিনি প্রদ্যুম্নকুঞ্জে এসে শ্রীবৈষ্ণবদাসকে যথাবিধি অভিবাদন পুরঃসর ঐ কুঞ্জে থাকবার জন্য একটু স্থান চাইলেন। বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে সে কথা জানালে, তিনি কুঞ্জের একপার্শ্বে একটি কুটীরে তাঁকে রাখবার আদেশ করলেন। তদবধি লাহিড়ী মহাশয় ঐ কুটীরে থাকেন ও নিকটস্থ কোন ব্রাহ্মণবাটীতে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করলেন। ●

বৈষ্ণব ঐতিহ্যের ইতিহাস

– শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুরে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গৌরপূর্ণিমা উপলক্ষে এক সপ্তাহব্যাপী 'মায়াপুর ইন্সটিটিউট অব হায়ার এডুকেশন' সংস্থায় প্রদত্ত এক বিশেষ প্রবচন থেকে সংকলিত।

সৃষ্টির আদিতেই বৈষ্ণব ধর্ম

সমস্ত ধর্ম আচরণের মধ্যে ভক্তিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। আবার ভক্তির মধ্যে শুদ্ধভক্তিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধভক্তির মধ্যেও প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ। ভক্তিপথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শিত যে প্রেমভক্তি সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু সেই প্রেমভক্তি দয়া করে আমাদের প্রদান করেছেন। ধর্মের পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই দানটি কেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সেটি আমাদের বিচার করতে হবে। এজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই চমৎকার পন্থাটি বা শিক্ষাটি হচ্ছে-

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধুবর্গেণ যা কল্পিতা॥
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমানমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ ন পরঃ॥

(চৈতন্যমন্তমঞ্জুষা)

আরাধ্য ভগবান হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ধাম হল বৃন্দাবন। ব্রজবধু ব্রজগোপিকারা যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত পুরুষার্থ বা সিদ্ধির চরম সিদ্ধি হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম। আর তার প্রমাণ হচ্ছে অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতম। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। আমাদের সাদরে সেটিই গ্রহণ করা উচিত। আর কোনো কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। এই পথে এগোনোর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল-

শুদ্ধভকত-চরণরেণু ভজন-অনুকূল।
(শরণাগতি, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।)

ইতিহাস মানে হচ্ছে ধারাবাহিক বিবরণ। অর্থাৎ কালক্রমে যা ঘঠেছে তার বিবরণ। ইতিহাস আর পুরানের মধ্যে পার্থক্য কি ? ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে হয় বা ক্রমপর্যায়ে তার বিবরণ হয়। কিন্তু পুরাণ বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন জায়গার ঘঠনা। যেমন, সত্যযুগের কোনো ঘঠনা, তারপরেই কলিযুগের কোনো ঘঠনা হতে পারে। তবে সেই ঘঠনাগুলি ভগবান এবং ভক্তের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

আমরা বৈষ্ণব ঐতিহ্যের ইতিহাস নিয়ে যখন আলোচনা করব, তখন মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাস মানে ক্রমে ক্রমে বা কালক্রমে যা ঘঠে–তার বিবরণ। সেই অনুসারে আমরা যখন বিচার করতে যাই, তখন দেখতে পাই যে, সৃষ্টির শুরু থেকেই এই বৈষ্ণবধর্ম বিদ্যমান। এই জ্ঞানটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির শুরুতেই প্রথমে ব্রহ্মাকে দান করলেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সৃষ্টির শুরুতেই বৈষ্ণব ধর্মের সৃষ্টি হল। কৃষ্ণ প্রথমেই ব্রহ্মাকে যে তত্ত্বটি দান করলেন, সেটা বৈষ্ণব তত্ত্ব। আর ব্রহ্মার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল বলেই ব্রহ্মা হলেন আমাদের আদি গুরু। আরও গভীরে গেলে দেখা যায়, এই বৈষ্ণবধর্ম কেবল ব্রহ্মার মধ্য দিয়েই শুরু হয়নি। এই বৈষ্ণবধর্ম অনাদি। এই জগৎ সৃষ্টির আগেও এই ধর্ম বর্তমান ছিল। চিৎজগতে সকলেই বৈষ্ণব, তাহলে দেখতে পাই, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও বৈষ্ণবধর্ম ছিল। এই জগৎ সৃষ্টি কিভাবে হল? ভগবান অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে একটা পদ্ম উদ্ভূত হয়, সেই পদ্মে রয়েছেন ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা থেকেই এই জগতের সৃষ্টি হল।

এইভাবে প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছেন, এক একজন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং তাঁর নাভিপদ্ম থেকে এক-একজন করে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে। আবার কারণসমুদ্রে শায়িত আছেন কারণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু। তাঁর নিঃশ্বাসের ফলে যে বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হচ্ছে, সেই এক একটি বুদ্‌বুদ্ হল এক একটি ব্রহ্মাণ্ড এবং সেই প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান প্রবেশ করে তাঁর স্বেদবারির দ্বারা নির্গত জলে ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধেকটা পূর্ণ করে সেই জলের উপর তিনি শয়ন করলেন, তাই তাঁর নাম হল গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু।

গর্ভ-উদক, উদক মানে হল জল। সেই গর্ভ-উদকের জলে শয়ন করে আছেন বলেই তিনি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুর নাভি থেকেই একটি পদ্ম উদ্ভূত হল। সেই পদ্মের কোরকে বসে আছেন-ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মা থেকেই সমস্ত জগতে জীবের সৃষ্টি হল। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মা সবকিছুর সৃষ্টি কার্য সাধিত করেন এবং এই ব্রহ্মাকে সৃষ্টির আদিতে স্বয়ং ভগবান দিব্যজ্ঞান দান করেছিলেন।

তেনে ব্রহ্মা হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসুরয়ঃ।

(ভাগবত ১/১)

এই দিব্যজ্ঞান হল বৈষ্ণব হওয়ার জ্ঞান। বৈষ্ণব শব্দের মূল হলেন বিষ্ণু। এই বিষ্ণুর যারা সেবক বা ভক্ত, তারাই হলেন বৈষ্ণব। অতএব সৃষ্টির আদিতেই বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব হল। আর প্রথম বৈষ্ণব হলেন ব্রহ্মা, তাঁর থেকে প্রথমে প্রজাপতিদের এবং কুমারদের সৃষ্টি হল। তারপরে নারদমুনি, এই নারদমুনি হলেন শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং সমস্ত জীবের গুরুদেব। জীবকে বিষ্ণুভক্তি দান করেন বলেই তিনি হচ্ছেন না-র-দ। এইভাবে নারদমুনির কৃপাতেই সমস্ত জীব বৈষ্ণব হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছেন। আমরা তাই দেখতে পাই, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রায় সকলেই নারদমুনির সান্নিধ্যে এসেই বিষ্ণুভক্তি লাভ করেছেন। যেমন, প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, মৃগারি সবাই নারদমুনির কাছ থেকে বিষ্ণুভক্তি লাভ করেন। নারদমুনি যে বিষ্ণুভক্তি দান করেন, সেটি হচ্ছে শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম। ভক্তি আবার অনেক রকমের হয়। সেগুলি

সাধারণত তিনটি পর্যায়ে পড়ে-

১। কর্মমিশ্রা ভক্তি, ২। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এবং, ৩। শুদ্ধভক্তি।

১। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মের প্রতি আসক্তি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত হল কর্মমিশ্রা ভক্তি এবং শুদ্ধভক্তির লক্ষণ হলো-

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/১/১১)

এই উত্তম ভক্তিটি হল অন্য অভিলাষ শূন্য। অন্য অভিলাষ মানে জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা এবং জড় জগৎকে ত্যাগ করার বাসনা। ভোগ এবং ত্যাগ এই দুইটি বাসনার থেকে মুক্ত হতে হবে। তবে যেখানে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছু অভিলাষ আছে। যেমন, কৃষ্ণের শরণাগত হয়ে কৃষ্ণের আনুগত্য মানা হল, কিন্তু তবুও জড় সুখভোগের বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা রয়েছে, তাহলে সেটি হল কর্মমিশ্রা ভক্তি। এই কর্মমিশ্রা ভক্তির স্তরে রয়েছেন স্বর্গের দেবতারা। আর কর্মী হল যারা ভগবানকে মানে না, তারা শুধু জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তারা ভক্ত নয়। আর কর্মমিশ্রা ভক্ত হল-যারা ভগবানকে মানছে, এবং জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনাও রয়েছে। এই স্তরের ভক্তরা হল কনিষ্ঠ স্তরের ভক্ত। যেমন, দেবতারা নারায়ণকে মানে কিন্তু আবার ভোগ করেও চলেছে। কিন্তু তবুও যখন অসুরদের দ্বারা দেবতারা বিপদে পড়ে, তখন ভগবান তাদের রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হন। এমন কি ইন্দ্রের ছোট ভাই হিসেবেও ভগবান বামনদেবরূপে এসে তাদের রক্ষা করেছেন। কিন্তু তবুও তাদের ভোগবাসনা রয়ে গেছে। তারা স্বর্গসুখ ভোগ করতে চায়। তাই তারা ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও শুদ্ধভক্ত নয়। তারা কর্মমিশ্রা ভক্ত আর যারা এই জড় জগতের ভোগবাসনা ত্যাগ করে মুক্ত হতে চায়, তারা হচ্ছে জ্ঞানী। এবং যে সমস্ত ভক্তের এই মুক্ত হওয়ার বাসনা রয়েছে তারাও শুদ্ধভক্ত নয়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, অনেক বৈষ্ণবেরাও এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্ত। যেমন, মহাপ্রভু যখন উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলেন, মধ্বাচার্যের যারা অনুগামী তত্ত্ববাদী–তাদের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়, তাতে তাদের বক্তব্য হল–মুক্তিই হল ভক্তির একমাত্র লক্ষণ। এই মুক্তি মানে কৈবল্য বা সাযুজ্য মুক্তি নয়। তারা সামীপ্য, সারূপ্য, সালোক্য এবং সার্ষ্টি এই চার রকমের মুক্তি কামনা করে বৈকুণ্ঠে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চায়। মহাপ্রভু সেই তত্ত্ববাদীদের যিনি আচার্য বা মহান্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- শাস্ত্রে বলা হচ্ছে ভক্তকে মুক্তি দেওয়া হলেও সে মুক্তি চায় না। ভগবান কপিলদেব বলেছেন যে-

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

(ভাগবত ৩/২৯/১৩)

অর্থাৎ তাদের মুক্তি দেওয়া হলেও তারা তা গ্রহণ করতে চায় না। তাহলে ভক্তকে ভগবানের সেবা ছাড়া যে কোন মুক্তি দিলেও সে যদি তা গ্রহন না করে তাহলে সেই মুক্তি কেন আমাদের লক্ষ্য হবে?

মহাপ্রভু দ্বিতীয় শ্লোকে বলেন-

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেহস্মান্।
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

মুক্তিদেবী মুকুলতাঞ্জলি হয়ে ভক্তের কাছে প্রার্থনা করে, তাকে যেন সেবা করার সুযোগ দান করা হয়।

তাহলে এখানে মুক্তিদেবী করোজোড়ে যদি ভক্তের কাছে প্রার্থনা করে যে, আমাকে সেবা করার সুযোগ দান করুন, তাহলে ভক্ত হয়ে সেই মুক্তি কেন গ্রহণ করবেন? মহাপ্রভু তাদের বোঝালেন, তোমরা ভক্তির মাধ্যমে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করছো, এটা প্রকৃতপক্ষে ভক্তির লক্ষণ নয়। তাহলে ভক্তির উদ্দেশ্য কি? ভক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রেম।

ভগবানের প্রতি প্রেম অর্জন করাই হচ্ছে ভক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সেই প্রেমভক্তি হচ্ছে শুদ্ধভক্তির চরম স্তর। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভক্তি তিন রকমের। যথা, কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও শুদ্ধভক্তি এবং এই শুদ্ধভক্তির চরম স্তরই হল প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তি দান করতেই মহাপ্রভু এসেছেন। প্রেমভক্তি লাভের উপায় হচ্ছে শুদ্ধ চিত্তে 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ ও কীর্তন করা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই শুদ্ধভক্তি অত্যন্ত অপূর্ব বস্তু এবং এই শুদ্ধভক্তি যে কোন ব্যক্তি লাভ করতে পারে।

যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/৬৭)

এখানে বলা হচ্ছে-যেই ভজে সেই বড়। এখানে কোন রকম উপাধির বিচার নেই।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

(নারদ পঞ্চরাত্র)

সেটি সমস্ত উপাধি-মুক্ত। মহাপ্রভু সেই সম্বন্ধে বলেছেন যে-

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

(পদ্যাবলী ৭৪)

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বাণপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। আমার একমাত্র পরিচয় হচ্ছে গোপীভর্তা যে কৃষ্ণ, সেই গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাসের অনুদাসের দাস। আর সেটিই হল বৈষ্ণবের প্রকৃত পরিচয়।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৮)

এই যে শুদ্ধ বৈষ্ণবের দৃষ্টান্তগুলি তার মধ্যে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত নিয়ে এখন আলোচনা করা হবে–

বৃত্রাসুর আপাতদৃষ্টিতে একটা অসুর হলেও তিনি

ছিলেন এক মহান বৈষ্ণব। তাহলে দেখা যাচ্ছে অসুরও বৈষ্ণব হতে পারে। অসুরও যদি বৈষ্ণব হয়, তাহলে তিনি আমাদের প্রণম্য। বৃত্রাসুর পূর্বজন্মে ছিলেন চিত্রকেতু। চিত্রকেতু সারা পৃথিবীর রাজা। লক্ষ লক্ষ তাঁর মহিষী, কিন্তু একটিও পুত্র নেই। ভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে তার প্রতিটি স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা। পুত্রহীন হওয়ায় যেহেতু তার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না,তাই চিত্রকেতু দুঃখে অত্যন্ত মুহ্যমান ছিলেন। এমতাবস্থায় একদিন অঙ্গিরা ঋষি এলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, চিত্রকেতু মহারাজ, আপনি কেমন আছেন ? মহারাজ বললেন, আমার সবকিছু থাকা সত্ত্বেও আমি পুত্রহীন। তাই আমার মনে কোন সুখ নেই। তখন অঙ্গিরা ঋষি বললেন-ঠিক আছে আমি একটা যজ্ঞ করবো। সেই যজ্ঞের ফলে তুমি একটি পুত্র সন্তান লাভ করবে, কিন্তু সেই পুত্র তোমার সুখ এবং দুঃখ দুইয়েরই কারণ হবে। তখন চিত্রকেতু ভাবলেন যে, আমার যদি একটা পুত্র সন্তান হয়, তবে অত্যন্ত সুখের কথা, তা নিয়ে একটু দুঃখ এলেও তখন মেনে নেওয়া যাবে। যথাসময়ে তার মহিষী কৃতদ্যুতির গর্ভে পুত্র সন্তান হল। তারফলে রাজা সর্বক্ষণ তার মহিষী কৃতদ্যুতি ও পুত্রকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। এতে তার অন্য মহিষীরা খুব ঈর্ষান্বিত হয়, তারা সেই সন্তানকে বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলে। রাজা অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। তখন নারদমুনি, অঙ্গিরা ঋষির সঙ্গে ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হন। তখন রাজা অত্যন্ত কাতরভাবে নারদমুনির কাছে প্রার্থনা করেন যে, এখন 'আমার এই পুত্রটিকে পুনর্জীবিত করুন'। নারদমুনি তখন রাজার অনুরোধে পুত্রটিকে পুনর্জীবিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন-তুমি কেন তোমার পিতা-মাতাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ ? তারা তোমার জন্য কত কষ্ট পাচ্ছে। তখন সেই পুত্রটি বলল-আমি বহুজন্ম এখানে এসেছি। কোন জন্মে মানুষ হয়েছি, কোন জন্মে পশু হয়েছি, কোন জন্মে পাখি হয়েছি। আপনি কোন্ জন্মের পিতা-মাতার কথা বলছেন ? এইভাবে চিত্রকেতু তখন বুঝতে পারলেন যে, এই জীবন কত অনিত্য, এই দেহটি নশ্বর, এবং জীব সর্বক্ষণ একদেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। এইভাবে চিত্রকেতুর প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হল এবং তখন নারদ মুনি চিত্রকেতুকে বিষ্ণুমন্ত্র দান করলেন। সেই মন্ত্র জপ করার ফলে চিত্রকেতু ভগবানের কৃপা লাভ করলেন। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, শুদ্ধভক্ত নারদমুনির কৃপাতে চিত্র কেতু ভক্ত হলেন। এইভাবে ভক্তের কৃপাতেই ভক্তি লাভ করা যায়। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন-

শুদ্ধভকত চরণরেণু ভজন অনুকূল......

এইভাবে চিত্রকেতু কৃষ্ণনাম জপ করার ফলে ভক্ত হলেও তার কিছু জড় জাগতিক কামনা-বাসনা ছিল। ফলে তার এই মন্ত্রের প্রভাবেই সাতদিনের মধ্যেই তিনি বিদ্যাধরদের রাজা হলেন। গন্ধর্ব-বিদ্যাধরেরা হলেন দেবতা, তারা উচ্চস্তরের জীব। তাদের রাজা হয়ে চিত্রকেতু তার মহিষীদের নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করছিলেন।

একদিন দেখলেন, কৈলাসে শিব, পার্বতীকে কোলে করে বসে আছেন এবং তাঁর চারপাশে সমস্ত মুনি ঋষিরা বসে আছেন, তা দেখে চিত্রকেতু মন্তব্য করলেন যে, এ কি রকম আচরণ। মহাদেব এত মহান উন্নত স্তরের জীব, অথচ তিনি সাধু সমাবেশে তাঁর পত্নীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এইভাবে শিবের সমালোচনা করার ফলেই পার্বতী, চিত্রকেতুকে অভিশাপ দিলেন, তুমি অসুর যোনি প্রাপ্ত হবে।

এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হচ্ছে যে, চিত্রকেতু যদিও পার্বতীকে অভিশাপ দিতে পারতেন, অভিশাপের প্রতি অভিশাপ দিতে পারলেও চিত্রকেতু তা করেন নি। এইটি হল বৈষ্ণবের লক্ষণ। বৈষ্ণব সর্বদা সবকিছুই ভগবানের কৃপারূপে গ্রহণ করে নেন। বৈষ্ণব কোন কিছুর প্রতিবাদ করেন না। চিত্রকেতুও প্রতিবাদ করলেন না। মাথা পেতে অভিশাপ অঙ্গীকার করে চিত্রকেতু সেখান থেকে চলে গেলেন। পরবর্তীকালে পার্বতীর অভিশাপের ফলে চিত্রকেতু বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহন করলেন। তিনি এতই প্রভাবশালী বা বীর্যবান ছিলেন যে, তিনি স্বর্গরাজ্যও অধিকার করে নিলেন। দেবতাদের পরাস্ত করে ত্রিভুবন জয় করলেন। দেবতারা পর্যন্ত তাঁর কাছে হেরে গেলেন। এমনই বৈষ্ণবের ক্ষমতা। বৈষ্ণবের শক্তি সমস্ত শক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ শক্তি। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র পর্যন্ত পরাজিত হলেন এবং কিভাবে বৃত্রাসুরকে বধ করে পুনরায় রাজ্য ফিরে পেতে পারেন, ইন্দ্র সেই উপদেশ প্রাপ্ত হলেন। জানা গেল যে, দধীচি মুনির কাছ থেকে যদি তাঁর অস্থি পাওয়া যায় অর্থাৎ দধীচি মুনির দেহের হাড়গুলি দিয়ে যদি একটা বজ্র তৈরী করা যায়, তবে সেই বজ্র দিয়েই বৃত্রাসুরকে বধ করা যাবে। তখন দেবতাদের সংগে ইন্দ্র গেলেন দধীচির কাছে। দধীচি মুনি সব কথা শুনে তাঁর দেহস্থ অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি করতে সম্মত হলেন। এখানে আমরা আর একটি মহান দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি, যাঁরা ভগবৎ ভক্ত, তাঁরাই এই রকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন। দধীচি বললেন-ঠিক আছে, এই দেহটি নশ্বর, আজকে না হোক কালকে, নয় তো একশত বৎসর পরে নষ্ট হবে। সুতরাং, দেহটি দিয়ে যদি কোনো ভাল কাজ হতে পারে, তবে তাই হোক। এই বলে তিনি তাঁর দেহটি দান করলেন। তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি হল এবং তা দিয়ে ইন্দ্র, বৃত্রাসুরকে সংহার করলেন। আমরা দেখতে পাই, বৃত্রাসুর যদিও জানতে পারলেন যে, তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু তবুও তিনি এতটুকুও ভয়ে ভীত হননি। অথচ কি সুন্দরভাবে ঐ সময় ভগবানের মহিমা কীর্তন করে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, ভগবান যেটা করবেন সেটা হবেই। ভগবান যদি ইন্দ্রকে রাজা বানান এবং তার ফলে যদি আমার মৃত্যু হয় তা হোক। ভগবানের বিধান আমি মেনে নেবো। এবং ভগবানের চরণাশ্রয় করেই আমি সব সময় থাকবো। এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভগবানের যিনি ভক্ত, তিনি যে কোন অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। একজন অসুর পর্যন্তও ভগবানের শুদ্ধভক্ত হতে পারেন। এখানে আমরা দেখছি, একদিকে বৃত্রাসুর অপর দিকে ইন্দ্র। এই দু'জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন বৃত্রাসুর। ইন্দ্র তার নিজের সুখ ভোগের জন্য অন্যকে তাঁর

(১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা

ভগবানের জন্ম

– শ্রীমন্ডলেশ্বর দাস

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং যিনি ভক্তরূপে ভগবানের দিব্য নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করার জন্য, আজ থেকে প্রায় ৫১৯ বৎসর আগে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শ্রীমতী শচীদেবী।

বিশ্বকোষ বা ইতিহাস বইয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম এবং সংক্ষিপ্ত জীবনীর কেবল উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্ত্বার কোন উল্লেখ আপনি পাবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এইসব বিশ্বকোষ, আর ইতিহাস বইগুলি ভগবৎ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতটুকু শিক্ষাই বা আমাদের দিতে পারে ? ভগবান এবং পারমার্থিক জীবনে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান ভাসা-ভাসা, একমাত্র তারাই হয়ত এই ধরনের পণ্ডিত সুলভ জীবনীচর্চায় সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যথার্থ পরিচয় এবং তাঁর দিব্য জন্মলীলার তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত হতে চান, তাদের অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করতে হবে। বৈদিক সাহিত্য হচ্ছে চিরকালীন, এবং সমস্ত শ্রেণীর মানুষেরাই তা পাঠ করতে পারে। আমরা যদি সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থেকে শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেই গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করি, তবে দেখতে পাব যে সেই গ্রন্থসমূহ এই সময়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এছাড়া ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানের গভীর এবং দুরূহ তত্ত্বসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার আর অন্য কোন পন্থা নেই।

বিশেষত পাশ্চাত্যদেশের মানুষেরা যখন শোনে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তারা তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। তারা জানতে চায় যে, কোথায় এবং কখন তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর শিক্ষা এবং লীলাসমূহই বা কি, ইত্যাদি। অনেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তখনকার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করার চেষ্টা করে। যেমন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে-সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সময় ইউরোপেও রেনেশাঁ বা নবজাগরণের সামাজিক পট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। সে সময় কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে অনেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে লুথার, টমাস, একুইনাস অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বলে বিবেচনা করেন। আবার অনেকে যখন শোনে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেড় হাজার বছর পরে (পঞ্চদশ শতকে) আবির্ভূত হয়েছেন। তখন তারা সিদ্ধান্ত করে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন নতুন ধর্মের প্রবক্তা মাত্র। আবার অনেকে মনে করে যে, "আমি তো কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম শুনিনি, এমন কি স্কুলের পাঠ্য বইয়ে তাঁর সম্বন্ধে কখনও পড়িনি, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন।"

কিন্তু ধৈর্য ধরুন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো একজন বৃহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আপনাকে প্রচলিত চিন্তাধারার থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। আপনার দৃষ্টিকে আরো উদার করতে হবে এবং যথার্থ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তবে একথা সত্যি যে, প্রথমাবস্থায় খুব দ্রুত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেতে ইচ্ছা করে। তাই আমি বলছিলাম যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য জন্মলীলাদির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদের বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের পর্যালোচনা করা উচিত।

জন্মহীনের জন্ম

বৈদিক শাস্ত্র এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-তত্ত্ব অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে দৃশ্যতঃ প্রধান পার্থক্যটুকু এই যে, কৃষ্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মূল স্বরূপেই পৃথিবীতে প্রকট হন কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুদ্ধভক্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ভগবদগীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্ম হয় না। যদিও তিনি বিভিন্ন সময়ে এই জড় জগতে অবতরণ করেন, কিন্তু তিনি হচ্ছেন 'অজ' বা জন্মহীন। শুধু শ্রীভগবানেরই বা কি কথা, আমার আপনার মতো সাধারণ জীবেরও জন্ম হয় না। শ্রীভগবান যেমন নিত্য-তত্ত্ব, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে আমরাও নিত্য। অবশ্যই এই জড় জগতে জন্ম একটি সাধারণ ঘটনা এবং সেটি সর্বক্ষেত্রেই

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে। জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে ॥

ঘটছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই জন্মটি কি ? আপনি, আমি এবং অন্যান্য সমস্ত জীবই হচ্ছি নিত্য-তত্ত্ব-'আত্মা'। আমরা শুধু এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছি, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতিতে জন্ম জন্ম ধরে দেহান্তরিত হচ্ছি। এইভাবে এক জীবনে হয়ত আমরা আমেরিকান, পরবর্তী জীবনে রাশিয়ান ; এক জীবনে হয়ত আমরা মানুষ আবার পরবর্তী জন্মে পশু অথবা বৃক্ষ ইত্যাদি। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছি প্রকৃতপক্ষে জন্মহীন এবং নিত্য, কিন্তু আমরা বারবার কোন না কোন জড় পরিচয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নিত্যস্বরূপে এই জন্ম-মৃত্যুর জগতের অতীত। তিনি যখন এই জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর সেই জন্ম আমাদের জন্মের সঙ্গে তুলনীয় নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপে এই জগতে প্রকট হন। সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য দেহকে 'অব্যয়াত্মা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'অব্যয়' মানে হচ্ছে নিত্য বা যার কোন বিনাশ নেই বা ক্ষয় নেই। তাই আমাদের জন্মের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য জন্মের এক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। যদিও আমরা হচ্ছি নিত্য, কিন্তু একটি অনিত্য জড় দেহ গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ক্ষেত্রে দেহ ও আত্মায় কোন ভেদ নেই। উভয়ই চিন্ময়। তাই শ্রীভগবান বলেছেন- **'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা'**- তিনি জন্মহীন এবং তাঁর দেহ নিত্য চিন্ময় তত্ত্ব, আমাদের মতো জড় নয়।

উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলে শ্রীভগবানের দিব্য জন্মের ব্যাপারটি আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হবে। যেমন-সূর্য, সূর্য সব সময়েই আকাশে রয়েছে অথচ সূর্যকে আমরা সবসময় দেখতে পারি না। সূর্যাস্তের পর এই পৃথিবী, সূর্য এবং আমাদের দৃষ্টি-পথের মাঝখানে এসে পড়ে। তারপর প্রায় বারো ঘন্টা পরে সূর্যোদয়ের সময় আবার আমরা সূর্যকে দেখতে পাই। এইভাবে সর্বত্র সূর্যোদয় ও সূর্যস্ত হচ্ছে, সূর্য আসছে-যাচ্ছে। কোন কোন আদিম মানব গোষ্ঠী হয়ত বলবে, সূর্যের জন্ম হচ্ছে আবার মৃত্যু হচ্ছে-কিন্তু সূর্য সবসময়ই রয়েছে। ঠিক সূর্যের মতই পরমেশ্বর ভগবানও সবসময় রয়েছেন। কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ অবস্থার জন্য কখনও তাকে দর্শন করতে পারি, আবার কখনও পারি না। আজ থেকে ৫১৯ বৎসর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হন, আমরা বলি তিনি জন্মগ্রহণ করলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর নিত্য চিন্ময় স্বরূপে সবসময়েই রয়েছেন। অতীতেও ছিলেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হচ্ছে এক চিন্ময়-তত্ত্ব।

বৈদিকশাস্ত্রে শ্রীভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে-

জন্ম কর্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্তু রাত্মনঃ।

তির্যঙ্‌নৃষিষু যাত্যঃসু তদন্তবিড়ম্বনম্‌ ॥ (ভাগবত ১/৮/৩০)

"হে বিশ্বাত্মন! এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, তুমি সমস্ত শক্তির মূল শক্তি ও জন্মহীন হওয়া সত্ত্বেও জন্ম গ্রহণ করে থাক।"

এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিশুরূপে আবির্ভূত হয়ে বালক, কিশোর, যুবারূপে ক্রমে ক্রমে বড় হলেন, এর অর্থ কি ? তার মানে কি এই যে, তাঁর দেহটি সাধারণ, অনিত্য এবং জড় ? না, মোটেই তা নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনই জড়-শক্তির দ্বারা প্রভাবিত নন এবং তিনি জড়-নিয়মের অধীনও নন। কিন্তু আমরা যেভাবেই হোক না কেন, জড় মায়ার অধীনে থাকার ফলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম-লীলাদি জড়রূপে দর্শন করছি। পরিষ্কারভাবে ব্যাপারটি বোঝার জন্য আবার সূর্যের উদারহরণে ফেরা যাক।

জড় জাগতিক প্রতিবন্ধকতা

কে বড় ? সূর্য না মেঘ ? নিশ্চিতভাবে সূর্য। প্রকৃতপক্ষে সূর্যই মেঘ সৃষ্টি করে। কিন্তু তবু একটা সময় আসে যখন মেঘদ্বারা সূর্য আবৃত হয়ে পড়ে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি ঘটেনা। সূর্য নয়, আমরাই মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হই। তেমনই, এই জড় জগৎ হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টি, কিন্তু মেঘের মতো এই জগৎ আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখে ভগবৎ-দর্শনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

তাহলে এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে এই বিনীত সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, আমরা জড় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য স্বরূপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য-জন্মলীলা হৃদয়ঙ্গম করার অযোগ্য। এই জড় জাগতিক প্রতিবন্ধকতা সমস্ত জীবের মধ্যেই মহামারীর মত ছড়িয়ে আছে-যা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হতে আমাদের বাধার সৃষ্টি করছে। তাই আজ থেকে ৫১৯ বৎসর আগে, পরম করুণাময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, যাতে আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা শ্রীভগবানের জ্যোতির্ময় রূপ উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর অতুলনীয় শিক্ষা শ্রবণ করে সেই শিক্ষার পরম অর্থকে আঁকড়ে ধরে এই জড় মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার পেতে পারি। অতএব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবকে জড়রূপে গণ্য করাটা হচ্ছে হঠকারিতা।

আরেকটি উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের প্রধান কখনও কখনও কোন কারণে, সরকারী কারাগারে প্রবেশ করেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি একজন কয়েদী। একমাত্র নির্বোধরাই ভাবতে পারে যে, 'আহা দেশের রাষ্ট্রপতিও আমার মত একজন কয়েদী।' রাষ্ট্রপতি যে কেবল কয়েদী নন তাই নয়, তিনি যে কোন কয়েদীকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিতে পারেন। তেমনই, কোন এক বিস্মৃত সময়ে আমরা শ্রীভগবানের বিরুদ্ধাচরন করার ফলে আমরা এই জড়-জগৎরূপ কারাগারে পতিত হয়েছি এবং জন্ম-জন্মান্তরের পরম শাসক পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে আমাদের উদ্ধার করার জন্য অবতরণ করেন, তখন তাঁর প্রকৃত স্বরূপের স্বীকৃতি প্রদান করাই হচ্ছে আমাদের উপযুক্ত কর্তব্য। পাষণ্ডী বা কয়েদীর মতো তাঁকে আমাদের সমপর্যায়ে টেনে নামানোর চেষ্টা করা উচিত নয়। আমরা যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবকে যথাযথভাবে

হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় বলেছেন-

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ (গীতা ৪/৯)

অর্থাৎ, 'যে আমার দিব্য অবতরণ ও কার্যাবলী হৃদয়ঙ্গম করে, তাঁকে আর পুনর্জন্ম লাভ করে এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না, সে আমাব নিত্যধাম লাভ করে।'

শ্রীভগবানের এই মনুষ্য জন্মলীলা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অতি উচ্চ ও অন্তরঙ্গ ভাবের প্রয়োজন। মনুষ্য জন্মের ন্যায়, প্রথমে একটি শিশুরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি সরাসরিভাবে কোন পিতামাতা ব্যতীত নিজেকে প্রকাশ করতে পারতেন। কেননা তিনি হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টি ও জীব সমূহের পিতা। প্রসঙ্গত পরমেশ্বর ভগবানের নৃসিংহদেবরূপে আবির্ভাবের ঘটনাটি স্মরণ করা যেতে পারে, মুহূর্তের মধ্যে অতি বিস্ফোরকভাবে তিনি এক পাথরের খিলান থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভাবের সময় তিনি এক কাঞ্চনবর্ণের শিশুরূপে মাতৃক্রোড় নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। শিশুরূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাব প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভক্তদের প্রতি পরমেশ্বর ভগবানের পরম কৃপা বিশেষ। একদিকে যেমন তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্তকে তিনি তাঁর পিতামাতারূপে প্রকাশিত হবার চরম কৃপা প্রদান করেন, অপর দিকে যারা সেই জন্মলীলা ও বাল্যলীলার কথা শ্রবণ করে তারাও মহাভাগ্যবানরূপে তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হন।

দিব্য অভিপ্রায়

শ্রীচৈতন্য মহপ্রভু এই জড়-জগৎরূপ কারাগারে আমার আপনার মত কর্মের অনমনীয় বিধান দ্বারা বাধ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারেই অবতরণ করেন। শ্রীভগবানের অবতরনের সেটিই নিয়ম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সাড়ে চার হাজার বৎসর আগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় তাঁর পারমার্থিক নির্দেশাবলীর সার তত্ত্ব প্রদান করে বলেছেন- **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'** সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে শুধু আমার শরণাগত হও। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে, শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তরূপে সেই শরণাগতির শিক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যে এই জগতে অবতরণ করেন। তিনি শুধু আত্মনিবেদনের শিক্ষাই প্রদান করেন নি, কিভাবে ভগবানের পবিত্র নাম-কীর্তনের মাধ্যমে আত্মনিবেদিত হতে হয় সেটি আচরণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনই তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু।

বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই, কলিযুগের 'যুগধর্ম' প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। আর সেই যুগধর্মটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম সংকীর্তন। তাই এটা অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের রাত্রিতে সেই পবিত্র নামও আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই রাত্রিতে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। বৈদিক নীতির নিষ্ঠাবান অনুগামীবৃন্দ, অসংখ্য ভগবদ্ভক্তগণ পবিত্র গঙ্গা নদীতে পূণ্য-স্নান করেছিলেন। গ্রহণ সম্পূর্ণ চলাকালীন সময় পর্যন্ত প্রত্যেকে নদীর জলে দাঁড়িয়ে বিধি অনুযায়ী ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করছিলেন। **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** ॥ এমন কি যারা কিছুই জানে না, সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তারাও সবাই হরিনাম করছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে যেন সেদিন হরিনামে আপ্লুত হয়েছিল।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

(১১ পৃষ্ঠার পর)

দেহটি পর্যন্ত ত্যাগ করতে বলছে। এটাই হল কর্মমিশ্রা ভক্তের দৃষ্টান্ত।

কর্মমিশ্রা ভক্তরা নিজেদের সুখভোগের জন্য সব কিছু করতে পারে। তাদের চিন্তাধারা হল, ঠিক আছে দধীচিমুনি দিয়ে দিক জীবনটা, কিন্তু আমি তো সুখভোগ করবো। কিন্তু যে শুদ্ধভক্ত সে কোন কিছুর পরোয়া করে না। সেইটি হচ্ছে বৃত্রাসুরের মাহাত্ম্য। এমনি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের প্রভাব এবং মহিমা। আমরা যে পথটি অবলম্বন করছি সেইটি হচ্ছে দৃষ্টান্ত।

ভক্ত সর্বদা গুরুত্ব দেন-কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর। তিনি যদি আমার দেহটা চান, তবে আমি তা দিয়ে দেবো। শুদ্ধভক্ত সর্বদা সেটাকে ভগবানের কৃপা এবং আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করেন। বৃত্রাসুর অসুর হলেও দেহের প্রতি তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ভাবলেন, যদি আমি অসুর যোনিও লাভ করি, তাতে তো ক্ষতি নেই, কিন্তু যেন কৃষ্ণকে কখনও না ভুলে যাই। এইটি হচ্ছে ভক্তের একমাত্র কামনা।

অসুর শব্দের দু'টি অর্থ, একটি হচ্ছে যারা ভগবদ্ বিদ্বেষী, দ্বিতীয়টি হল দেবতাদের যারা বিরোধী। কিন্তু তিনি ভগবদ্ বিদ্বেষী নাও হতে পারেন। সুরদের অর্থাৎ দেবতাদের বিরোধী বলেই তিনি অসুর।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, ভীষ্মদেব এবং কুমাররাও একটা স্তরে জ্ঞানমিশ্রা ভক্ত। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তরা সব সময় যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্ত তা নয়। একটা স্তরে তারা জ্ঞানমিশ্রাভক্ত। তারপরে তারা শুদ্ধভক্তের স্তরে আসতে পারে। যারা মুক্তি কামনা করে তারা জ্ঞানমিশ্রা ভক্ত। ভীষ্মদেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্ত হওয়ার কারণ তিনি শাস্ত্রের নীতির উপর বেশি জোর দিয়েছেন। কৃষ্ণভক্তির কাছে তাদের ন্যায়নীতিটা বড় বলে প্রতিপন্ন হয়। এখানে ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করছেন না কেন ? তার কারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হচ্ছে, যার অন্ন খাবে তার পক্ষ অবলম্বন করা। যেহেতু তিনি দুর্যোধনের অন্ন খেয়েছেন, তাই তিনি দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। কিন্তু অন্তিম সময়ে আবার শুদ্ধভক্তের পন্থা অবলম্বন করেছেন। তার দৃষ্টান্ত হল-ভীষ্মদেব যখন যুধিষ্ঠির মহারাজকে তাঁর শরশয্যা অবস্থায় উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন দ্রৌপদী মুচকি হাসলেন। তার মুখের হাসি দেখে ভীষ্মদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হাসলে কেন ? তখন দ্রৌপদী বললেন যে, যখন কৌরবরা আমায় অপমানিত করেছিল, তখন আপনার এই উপদেশ ও তত্ত্বজ্ঞান কোথায় ছিল ? তখন ভীষ্মদেব বললেন, সেই সময় যেহেতু আমি দুর্যোধনের অন্ন খেয়েছিলাম, তাই আমার চিন্তাধারা দূষিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই শরশয্যায় শয়নের ফলেই আমার শরীর থেকে সেই সমস্ত দূষিত রক্ত বের হয়ে গেছে। সেইজন্য এখন আমি সেই চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। অর্থাৎ ভীষ্মদেব আগে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তের স্তরে ছিলেন। পরে শুদ্ধভক্তের স্তরে উন্নীত হয়েছেন।

– (চলবে)

অশৌচের প্রকার ভেদ

– শ্রী পুষ্পশীলা শ্যাম দাস ব্রহ্মচারী

আমরা পূর্বের সংখ্যায় বৈষ্ণব অশৌচ বা মৃতাশৌচ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করেছিলাম। আমরা আবারও অশৌচের প্রকার ভেদ বিষয় আলোচনা করব। সর্বাগ্রে পক্ষিনী অশৌচ কাকে বলে, দুই রাত্রি এক দিবস অথবা দুই দিবস এক রাত্রি এই কালকেই পক্ষিনী বলা হয়।

পক্ষিনী অশৌচ

অদন্তজননাৎ সদ্য অচূড়ান্তাদহ নির্শম।

অব্রতস্থাৎ ত্রিরাত্রেনত দৃদ্ধং দশভিদ্দি নৈঃ ॥ (গঃ পুঃ পর্বঃ খঃ ১৫)

অর্থাৎ যে পর্যন্ত নামকরণ না হয় সে পর্যন্ত সদ্য অশৌচ, এবং যে পর্যন্ত চূড়াকরণ অর্থাৎ দুই বৎসর পর্যন্ত বয়স্কার মরনে অহোরাত্র অশৌচ পালন করতে হবে। এরপরে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পক্ষিনী অশৌচ পালন করতে হবে। বিবাহের পরে মৃত্যুতে পূর্ণাশৌচ দশদিন পালনীয়।

সূতিকাশৌচ

পুত্রজননে প্রসূতি ২০ দিন এবং কন্যা জননে একমাস প্রসূতি অশৌচ হয়, কিন্তু দশ দিনের পর অঙ্গ স্পৃশ্যতা দোষ থাকে না।

অজাতদন্তা যে বালা যে চগর্ভাদ্বিনির সৃতাঃ

নতেষাংমেগ্নি সংস্কারো ন পিণ্ডনোদ কক্রিয়া। (গঃ পুঃ পূর্বঃ খঃ ১৬)।

অর্থাৎ যে সমস্ত বালকের দন্ত উদ্গত হয় নাই, যে বালক গর্ভ হতে নিঃসৃত হয়ে মৃত্যুবরন করেছে তাদের অগ্নি সংস্কার নাই, তাদেরকে মাটিতে পোতিত করতে হবে। তাদের জন্য কোন তর্পন বা পিণ্ড প্রদান প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র ভগবানের সন্তোষ্টি বিধানের জন্য পূজার্চনা ও ভোগরাগ করা প্রয়োজন।

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত অশৌচবিচার

গর্ভস্রাবে কেবলমাত্র প্রসূতি অশৌচ হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এই চার মাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হলে তাকে গর্ভস্রাব বলা হয়, আর গর্ভস্রাবে পক্ষিনী অশৌচ পালন করতে হয়, **আচতুর্থা ভবেৎ স্রাবঃ পাত পঞ্চম ষষ্ঠয়োঃ** (গঃ পুঃ পর্ব খঃ ১৭) অর্থাৎ চারি মাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হলে গর্ভস্রাব বলা হয়, আর পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাস পর্যন্ত যত সংখ্যক মাসে গর্ভপাত হয় ততদিন অশৌচ থাকবে, তার উপর আরও এক দিন অশৌচ পালন করে প্রসূতি সর্ব্ব কর্ম্মের অধিকারীনী হবেন।

জীবিত সন্তান প্রসবান্তে সেদিন সন্তানের মৃত্যু হলে, ৭ম বা ৮ম মাসোক্ত গর্ভপাতের ন্যায় অশৌচ পালন করতে হবে। একদিন জীবিত থাকলে তৎপরে সন্তানের মৃত্যু হলে ৯ম মাসের জাত সন্তানের ন্যায় অশৌচ পালন করতে হবে।

কিন্তু কোন অবস্থাতেই ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের অশৌচ পালন করতে হবে না।

ব্রহ্মচার্য্যাদ গ্নিহোত্রান্ন শুদ্ধিঃ গঙ্গাবর্জ্জনাৎ (গঃ পুঃ পুঃ খঃ ১৮)

অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বা অগ্নিহোত্রী তাদের কোন অশৌচ নাই, কারণ তারা সর্ব্বসঙ্গবিহীন বিধায় তাদের কোন রূপ অশৌচ স্পর্শ করতে পারেনা।

আমরা সামাজিকভাবে অশৌচ নিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় পরি। যেমন, যে কোন মাঙ্গলিক কাজের দিন ঠিক করা হলো, কিন্তু হঠাৎ করে মৃতাশৌচ বা জননাশৌচ উপস্থিত হয়ে গেল, তখন আমরা কি করব সে বিষয়ে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

বিবাহোৎ সব যজ্ঞেষু অন্তরা মৃত সূতকে।

পূর্ব্ব সঙ্কল্পিতাদন্য বজ্জনঞ্চ বিধীয়তে ॥ গঃপুঃপূর্ব খঃ ১৯

অর্থাৎ বিবাহ যজ্ঞ ও মাঙ্গলিক কার্য্যের সময় যদি মরনাশৌচ বা জননাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহলে পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত কার্য্য পরিত্যাগ করতে হবে। গরুড় পুরানে আরও বলা হয়েছে-

মৃতেন শুধ্যতে সৃতি মৃতকং মৃতকান্তরাৎ॥ (গঃপুঃপূর্বঃ খঃ ২০)

অর্থাৎ যদি সন্তান মরনাশৌচের মধ্যে জন্মিয়া অশৌচের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সূতিকা সেই মরণাশৌচ দ্বারা উভয় অশৌচ হতে শুদ্ধি লাভ করবে। একটা মরণাশৌচের মধ্যে যদি অন্য মরণাশৌচ হয়, তাহলে পূর্ব্ব অশৌচের সহিত শেষোক্ত অশৌচ শেষ করতে হবে। কিন্তু এখানে লঘু ও গুরু বিচার করতে হবে।

১। সপিন্ডের মরণাশৌচ হতে নিজের মাতাপিতা গুরু অশৌচ এবং স্ত্রী লোকের পক্ষে স্বামীর মরণাশৌচ গুরু অশৌচ–এভাবে সম্বন্ধ ভেদে লঘু গুরু অশৌচ বিচার করতে হবে। কিন্তু লঘু অশৌচ দ্বারা কোন অবস্থাতে গুরু অশৌচকে নিবৃত্তি করা যায় না–এটাই সাধারণ বিধি। পিতামাতা-পুত্রের মহাগুরু, স্ত্রী-লোকের মহাগুরু-স্বামী, অবিবাহিতা কন্যার মহাগুরু-পিতামাতা এবং আচার্য্য দিক্ষা গুরু, মহাগুরুজনের নির্যান ঘটিলে প্রথমে ত্রিরাত্র উপবাস বিধি, অসমর্থ পক্ষে এক আহোরাত্র উপবাস করবেন। এখানে আর কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের মাঝে আসে, সেই প্রশ্ন কয়টি হলো : ১। জাতি ২। সপিন্ড এবং ৩। সাকুল, আমরা কিভাবে বুঝব নিম্নে আলোচনা করা হল-

নিজেকে ধরে উর্দ্ধ ৭ম পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতি; আর জ্ঞাতির সন্তানগনই সাপিন্ড, ১০ম পুরুষ পর্যন্ত সাকুল্য এবং ১৪শ পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতিকে সমানোদক, তাদের পরবর্ত্তী সন্তানগনই গোত্রজ নামে অভিহিত হয়।

খন্ডা অশৌচ বিচার

মতামহ মরনে ও শ্বশুর বা শ্বাশুড়ীর মৃত্যুতে জামাতা ত্রিরাত্র অশৌচ পালন করবে। নিজের মাতুল, মামাতো, পিসতুতো, মাসতুতো ভাই পিতার মামাতো, পিসতুতো, মাসতুতো ভাই, মাসী, বিবাহিতা ভগ্নি, মাতামহী মৃত্যুতে পক্ষিনী অশৌচ পালন করতে হবে।

কন্যার পক্ষে অশৌচঃ পিতা মাতার মৃত্যুতে বিবাহিতা কন্যা ত্রিরাত্র অশৌচ পালন করবে।

কোন ব্যক্তি দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিত হয়ে বা কারো দ্বারা অস্ত্রাঘাতে ক্ষত হয়ে যদি ৭ দিনের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে তাহলে ত্রিরাত্র অশৌচ হবে এরপর মৃত্যু হলে পূর্ণাশৌচ দশ দিন পালন করতে হবে।

হিংস্র পশু ও সর্পাদি দ্বারা দংশিত হয়ে, বৃক্ষাদি হতে পতিত হয়ে বা অগ্নিদগ্ধ, জলমগ্ন, বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করে তিন দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে পূর্ণাশৌচ ১০ দশ দিন পালন করতে হবে। প্রতিটি অশৌচান্তে ভগবানের প্রীতার্থে বিশেষ পূজার্চনা ও ভোগরাগ করা উচিত।

তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীনিতে প্রীনিতং জগৎ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টিতেই সমস্ত জগৎ তুষ্ঠ হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানন্তি ত ত্তেনাতশ্চ্যবন্তি যে ॥ (গীতা ৯/২৪।)

অর্থাৎ আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানে না, তারা আবার সংসার সমুদ্রে পতিত হয়, তাই সমস্ত বৈদিক কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্টি করা–

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা॥ (ভঃ রঃ সিঃ) অর্থাৎ শুধুমাত্র কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত।

এই অশৌচ বিচার শুধু বৈষ্ণবদের জন্যই পালনীয়, এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সকল বর্ণের জন্য এই অশৌচ পালনীয় এবং সর্বশাস্ত্র সম্মত।

অদ্বৈতবাদ (মায়াবাদ) বনাম দ্বৈতবাদ (ভক্তিবাদ)

– শ্রী মনোরঞ্জন দে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পক্ষান্তরে দ্বৈতবাদী বা বৈষ্ণববাদীগন যুক্তি দেন যে জীব চিন্ময় একথা সত্য। তবে সে পরব্রহ্মের সাথে সব দিক দিয়ে এক বা অভেদ হতে পারে না। তাদের মতে জীব গুনগত দিক থেকে ব্রহ্ম হলেও পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত চিৎশক্তির মধ্যে সর্বপ্রধান চিৎশক্তি। অর্থাৎ জীব হল অনুচৈতন্য এবং পরমেশ্বর ভগবান হলেন বিভু-চৈতন্য। এই হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ দর্শনের মূলকথা–অর্থাৎ জীব এবং পরমেশ্বর ভগবান যুগপৎভাবে এক এবং ভিন্নও বটে। সহজ কথায় বলা যায় জীব পরম ব্রহ্মের সাথে গুনগত ভাবে অভেদ বা একই রকম। কিন্তু পরিমানগতভাবে পরব্রহ্ম (পরমেশ্বর ভগবান) হলেন অসীম অথচ জীব অনুমাত্র।

অদ্বৈতবাদীরা যুক্তি দেন যে জীব এবং পরম ব্রহ্মের মধ্যে যদি কেউ প্রভেদ/পার্থক্য টানে, তবে তার মূল কারণ হল মায়া এবং ভ্রম (false)। কারণ পরম ব্রহ্মই সত্য। আর সবই মায়া বা ভ্রম। দ্বৈতবাদী তথা বৈষ্ণব আচার্য্যেরা বলেন যে, উপরোক্ত মতবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য্য বার বার বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অস্বীকার বা লংঘন করেছেন। মধ্বাচার্য্য তাঁর বিভিন্ন লেখায় অনুচৈতন্য বিশিষ্ট আত্মা এবং বিভু চৈতন্য পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে শঙ্করের নিরাকার বিশিষ্ট পরম ব্রহ্ম সম্পর্কিত তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি তাঁর দর্শনে তিনটি বিষয় বিবেচনা করেন ঃ পরমেশ্বর ভগবান, জীব এবং জড়-জগৎ। তিনি বলেন, ভগবান এবং জীবের মধ্যে চিন্ময় স্তরেও স্বতন্ত্রতা আছে। কারন চিন্ময় স্তরেও জীব ভগবানের দাস রূপেই থাকেন। শঙ্করাচার্য্য পরম ব্রহ্মকে ব্রহ্মান্ড সমূহের জড়-কারণ হিসাবে বর্ননা করেন। মধ্বাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রের মুখ্য ধারনা অবলম্বন করে যুক্তি দেন যে, পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতের উর্ধ্বে পারমার্থিক স্তরে অবস্থান করেন। জড়-জগৎ হল তাঁর নিকৃষ্ট/গৌন শক্তির ফলাফল/সৃষ্টি, যাকে অপরা প্রকৃতি বলা হয়। এক কথায় পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জড়-সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। আবার একই সাথে জীবও (জীবাত্মা) জড়-বস্তু থেকে স্বতন্ত্র। জীব জড়-বস্তু থেকে উন্নত। কারণ জীব পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শক্তির অংশবিশেষ। তবে জীব পরমেশ্বর ভগবানের অনুশক্তি বলে তাঁর নিত্যদাস মাত্র। পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। আর জীব তাঁর উপর পুরাপুরি নির্ভরশীল। পরমেশ্বর ভগবানই বিভিন্ন ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংস করেন এবং একই সময়ে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপে তিনি প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত সব কিছু থেকেই উর্ধ্বে অবস্থান করেন। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের উপরোক্ত মতবাদকে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ (pure dualism) বলা যায়।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজও আত্মা এবং পরমাত্মার স্বতন্ত্র অবস্থানের কথা তাঁর বিভিন্ন লেখা এবং ভাষ্যে তুলে ধরেন। আত্মা এবং পরমাত্মার স্বতন্ত্রতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অগ্নি এবং অগ্নি স্ফুলিংগের উদাহরণ দেন। পরমাত্মাকে যদি অগ্নি বলা হয়, তবে আত্মা সেই সর্বব্যাপী অগ্নির বিভিন্ন স্ফুলিঙ্গ মাত্র বলা যায়। তিনি বলেন জীবাত্মা (জীব) দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। পক্ষান্তরে ভগবান জড় জগৎ এবং এর মধ্যে অবস্থানকারী জীবকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেহ হল জীবের আচরনের একটি মাধ্যম মাত্র। জড়জগৎ হল ভগবানের লীলা বা মহিমার একটি অন্যতম মাধ্যম। মুক্তির পরও জীবাত্মা সুক্ষ্মদেহ ধারন করে নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখে। জীবাত্মা বিভিন্ন ধরনের ঘঠনার অভিজ্ঞতা (জড়া-ব্যধি, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি) লাভ করে। জড় দেহ এই অভিজ্ঞতার মাধ্যম মাত্র। কর্ম অনুযায়ীই জীব বিভিন্ন ধরনের দেহে অবস্থান নেয় মাত্র। শ্রীপাদ রামানুজের এই দর্শন বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত।

উপরোক্ত উপায়ে বৈষ্ণব আচার্য্যগন তাদের দ্বৈতবাদী দর্শনের মাধ্যমে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে গুনগত একত্ব এবং পাশাপাশি পরিমানগতভাবে স্বতন্ত্রতার বিষয়টি তুলে ধরেন। জীব যেন একটি স্বর্ণের অলংকার, আর পরমেশ্বর ভগবান যেন স্বর্ণের খনি। শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা এবং ভক্ত অর্জুনকে বলেন ঃ-

"ন ত্বে বাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম।"

অর্থাৎ হে অর্জুন, এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি এবং এই সমস্ত রাজারা ছিল না; ভবিষ্যতেও কখনো আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না। এ থেকেই বুঝা যায় আত্মা এবং পরমাত্মা/ভগবান স্বতন্ত্র; তারা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অনুযায়ী এক/অভেদ নয়।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য পরব্রহ্ম এবং জীবাত্মার চূড়ান্ত পর্যায়ে একত্ব হওয়ার বিষয়টি অনুধাবনের জন্য একাধিক দেবতার পূজা-অর্চনার বিষয়টি উৎসাহিত/অনুমোদন করেন। তাঁর মতে পরব্রহ্ম সর্বভূতে বিরাজমান। তাই কোন জড় শক্তিকে পূজা-অর্চনা করলেও পরব্রহ্মের গুনাগুন উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

বৈষ্ণব আচার্য্য তথা দ্বৈতবাদীগণ শঙ্করের উপরোক্ত বক্তব্য নাকচ করে দিয়েছেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে কোন অধিদেবতার (demigod)সাথে পরমেশ্বর ভগবানের একত্বতা কল্পনাও করা যায় না। তাঁরা ব্যক্তিসত্ত্বার পূজা, অধিদেবতার পূজা, এবং পরমেশ্বর ভগবানের পূজার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের বিষয়টি তুলে ধরেন।

– চলবে।

অধনে যতন কৈনু ধন তেয়াগিয়া

-মণিগোপাল দাস

শাস্ত্র বলে থাকেন- এই মানবজীবন অতিশয় সুদুর্লভ। ইহা এমনি একটি নৌযান যা'র দ্বারা দুর্লঙ্ঘ্য, দুরতিক্রম্য ভবসাগররূপ মহাজলধি নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু আমি এমনি এক পাষন্ড যে এই অসার সংসারের জনম-মরণ মালায়, দুঃখ যন্ত্রনার জ্বালায় আটভাজা হলেও এই সংসারের দাবাগ্নিতে পুড়ে ছাই হতে চাই। জগতের লোকের মরণদশা আমার অর্থোপার্জন চেষ্টা, কামোপভোগ চেষ্টা, অপরকে ঠকাবার চেষ্টা, প্রতিষ্ঠাশারূপী বরাহবিষ্ঠা চেষ্টা, অনিত্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি চেষ্টায় বিন্দুমাত্র বিঘ্ন ঘটাতে পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থ।

করুণাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর-

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

এই কথা আমার কর্ণকুহরে ক্ষনকালের জন্য প্রবেশ করতে চাহে না। আর চাইলেও তাহা কর্ণের ত্রিসীমানায় ঘেষতে না দিবার জন্য জগতের সকল আবর্জনা দ্বারা এই কর্ণ পূর্বেই Fullfill করে রাখি। তাই শ্রীভাগবত শাস্ত্রে বলেন ঃ

বিলে বতোরুক্রমাবিক্রমান যে ন শৃন্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায় উরুগায় গাথাঃ।

(ভা:-২/৩/২০)

আমার এই কর্ণরন্ধ্র সর্পের গর্তের ন্যায়। ভগবদালাপ ব্যতীত এই জিহ্বা অসতী রমনী কিংবা ব্যাঙের জিহ্বাতুল্য, যে শুধু বৃথা অপলাপের মাধ্যমে তাহার মরণ শীঘ্রতর করে দেয়। ভগবদ্ভক্ত যেন কস্মিনকালেও আবাসবাটির চেহারা পর্যন্ত দেখতে না পায়, সেজন্য বাড়ী পাঁচিল সার্দ্ধসপ্তহস্ত পরিমান বর্ধিত করে তদুপরি বিলেত হতে আনানো লোহার মজবুত পেরেক ঠুকে দেই। পাছে কোন প্রকারে তারা আমার আনন্দের অন্দরমহলে হরিনামের হট্টগোল শুরু করে দেয়, আমাকে মায়ার চাকুরি হতে বরখাস্ত করিয়ে কৃষ্ণের চাকুরীতে নিযুক্ত করে, এই ভয় সদা অন্তর্দেশে বীণা বাজিয়ে যায়।

অর্থ আছে কিন্তু অর্থের বিকার নাই, জগতে এরূপ লোক দুর্লভ বটে। যারা আছেন তারাই প্রকৃত অর্থশীল। এই অর্থের জন্য শরীরের রক্ত কণিকা জল করে নিরন্তর অর্থোপার্জনে নিরত হই। অর্থই আমাদের ধ্যান, আমাদের জ্ঞান, অর্থই আমাদের তপ:। অধিক কি- অর্থই আমাদের পুরোহিতের পূজা, আমাদের সপ্তাহব্যাপী ভাগবত পাঠ, অর্থই আমাদের আশ্রমের উৎসব ও প্রতিমাপূজা। পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়, উদ্দেশ্য- বিদ্যালাভ নহে, পরন্ত ভাবীকালে প্রচুর অর্থসংগ্রহ। সেই বিদ্যার্জনের জন্য বর্তমানকালে বিদ্যার বহুবিধ শাখা তাহার প্রশাখা বিস্তার করেছে। যেমন ঃ Economics, finance ইত্যাদি। আরও কত কী, কিন্তু কী আশ্চর্য, যে অর্থ আমাদিগকে জগতের ত্রিতাপ জ্বালা হতে মুক্তি দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ, দুই কোটি টাকা যেস্থলে মনোরাজ্যের দুই আনা শান্তি আনয়নে অপারগ, অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মান্ডের সকল ঐশ্বর্যরাশি উৎকোচস্বরূপ দিয়াও যেখানে মরণকালে শমনদূতের কার্য হতে তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনা, সেস্থলে আমরা শুধু অর্থ অর্থ করে সারাটা জীবন অনর্থে পর্যবসিত করলাম। একটিবারও ভুলক্রমে এই জগতের অনিত্যতা উপলব্ধিতে সচেষ্ট হলাম না। বিদ্- ধাতু হতে বিদ্যা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে জানা। অর্থাৎ যিনি জেনেছেন বা বিদ্যা লাভ করেছেন, তিনিই বিদ্বান কিন্তু বর্তমানকালে বিদ্বানের সংজ্ঞা পাল্টিয়েছে। অপরকে কি প্রকারে, কত প্রকারে বঞ্চনা করে নিজে বেশী ভোগ করা যায়, নিজে সাধু সেজে কিভাবে অপরকে ভোগা দেয়া যায়, কিভাবে সভ্যতার আচ্ছাদনে যতসমস্ত অসভ্য কর্ম করা যায়, এই কূটনীতি শিক্ষাকে আধুনিককালে বিদ্যা বলা হয়ে থাকে। যে যত পরিমানে নরকের দিকে সোজা পথে চলে তত পরিমাণ বিদ্বান, আর তাই আমাদের এত দুঃখ।

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ

কিরূপে (অ) বিদ্যা শিক্ষা করে সসাগরা পৃথিবীর উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করা যায় ইহাই আমাদের বর্তমানের আদরনীয় বিষয়। অধিকাংশ পিতামাতারাও আজকাল এরূপ চাহেন। পুত্র অপরের বাড়ী লুন্ঠন করিল, না অপরের গলায় ছুরি বসাল, না অপরের স্ত্রীর প্রতি বলাৎকার করিল তাহা তাদের বিবেচ্য বিষয় নহে। পুত্র কি পরিমানে টাকা দিয়ে তাদের শয্যাবিলাস করল, ইহাই আজিকার তথাকথিত সভ্যতা। যে ছেলে টাকা রোজগার করেনা, সে পিতামাতা স্বজনগণ কর্তৃক গৃহতাড়িত হয়। যে স্বামী অর্থ উপার্জন করে না, তাকে সর্বদা স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। এমনকি কালেভদ্রে সেই সকল গুণবতী (!) রমণীগণ বলে থাকেন- "খাওয়াতে পারবে না, তো বিবাহ করেছিলে কেন ? বস্ত্রভূষণ অলংকারাদি দিতে পারবে না, তো বিবাহের পিঁড়িতে বসবার কী আবশ্যকতা ছিল ? হায় ভগবান ! হতচ্ছাড়াটা আমার হাড় জুড়াল।" কিন্তু অর্থ না থাকলেও দময়ন্তীর মতো নিজে উপবাসী থেকে স্বামীকে ভোজন করান, নিজের পরিধেয় বস্ত্রের ছিন্ন অর্ধাংশ স্বামীকে পরিধান করান, এই জাতীয় স্ত্রী আজ অতীব বিরল সুতরাং জগতে সম্প্রীতির নামে অদ্য যা কিছু চলছে সকলই, অর্থপ্রীতি ব্যতিত অধিক কিছু নহে।

এই সম্পর্কে একটি কাহিনী মনে পড়ল। কোন এক ব্যক্তির চারটি পুত্রের মধ্যে তিনটি বিদ্যাশিক্ষা করে অর্থোপার্জনে নিযুক্ত হল ও পিতামাতার মনোভিলাষ পূরণ

করল। কিন্তু চতুর্থ পুত্রটি অল্পমাত্র অধ্যয়নে চরিত্রহীন হয়ে গেল। পরবর্তীতে পিতামাতা ও স্ত্রীর যৎপরোনাস্তি পীড়নে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে বেশ কিছু টাকা উপার্জনে সক্ষম হলো, তখন তাহার পিতা সর্বসমক্ষে পুত্রের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ হলেন- "আমার গোপাল একটি রত্ন বটে, সেইত সব করেছে ও করছে"। বলাবাহুল্য গোপাল তখন আর গোপনে মদ্যপানাদি করে না। চৌরাস্তার মোড়ে প্রকাশ্যেই করে থাকে। এখন আর সে কাকে ভয় করবে? এখানে গোপাল রত্ন না গোপালের অর্থই রত্ন তাহা বিচার্য বিষয়।

প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যার মন।
প্রয়াসী তাহার নাম ভক্তিহীন জন ॥

প্রাণীমাত্রেই প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ঐযে বিষ্ঠার কৃমি সেও বিষ্ঠাগর্তে ছুটাছুটি করছে, পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে গর্তান্তরে প্রবেশ করছে, শূকর বিষ্ঠাভোজনের নিমিত্ত ছুটছে, গর্দভ ভারবহনে প্রবৃত্ত, কুকুর প্রভুভক্তির পরিচয়দানে ঘেউ-ঘেউ করছে ও কখনও বা কুকুরীর পেছনে দৌড়ে স্ত্রৈণ ব্যক্তিকে বলছে, "দেখ দেখ, তোমারও এই দূর্গতি! তোমার এখন আর মনুষ্যত্ব নাই, তুমি মানুষ বলে আর বড়াই করতে পারনা। তুমি যে আমাপেক্ষাও অধম হয়ে পড়েছ, মনুষ্য জন্মে হরিভজনাধিকার হতে তুমি বঞ্চিত হয়ে পড়ছ।" মধুমক্ষিকা কত পরিশ্রম করে মৌচাকে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু কোন একটি ব্যক্তি এসে তার সকল আশা ভরসা নিংড়াইয়া নিয়ে যাচ্ছে। কখনও তাহার সুদৃশ্য বাসগৃহ বিনাশ করছে, কখনও সবান্ধবে তাহার প্রাণনাশ করছে। তখন সেই মক্ষিকা বলছে- "হে মুর্খগণ, আমাকে দেখে সংশোধন হও। কাহার জন্য এত প্রচেষ্টা করছ? তুমি চব্বিশ ঘন্টা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাহার জন্য এত উদ্যম করছ? ইহার পরিনাম কী একটিবারও ভাববে না? ঐ দেখ চোরদস্যু তোমার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তোমার সাধের বাসগৃহে আগুন লাগাবে, একরাত্রেই তোমার সকল আশাভরসা মিটিয়ে দিবে, তোমার সমুদয় অর্থ লুণ্ঠন করবে, একটি পয়সাও তোমার জন্য রেখে যাবে না, তোমার প্রাণপ্রিয় পত্নীর প্রতি বলাৎকার করবে, প্রাণসম পুত্রের বুকে ছুরি বসাবে, তোমার মস্তকটি নারিকেল ভাঙ্গা করবে। তাই বলি আমার পরিণাম দেখে সতর্ক হও। তুমি মনুষ্য, তোমার হুঁশটি হারিওনা। তোমার সকল অর্থ হরি, গুরু, বৈষ্ণবসেবায় লাগিয়ে দাও।

তুমি ভুলিও না- তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

এই ধ্বনিটি কী তোমার কর্ণে প্রবেশ করবে না? তোমার অর্থ সংগ্রহ চেষ্টাটি দোষাবহ নহে, তবে তার ব্যবহারটিই দোষের হয়ে পড়েছে।"

এই মনুষ্যজন্ম পেয়ে যে ব্যক্তি তাহা হরিভজনে নিযুক্ত করল না, শাস্ত্রগোচরে সে আত্মঘাতী ব্যতিত আর কিছুই নহে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে বলেছেন-

লব্ধাসুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মনুষ্যমর্থাদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্ নিঃশ্রেয়সায় বিষয় খলু সর্ব্বত স্যাৎ ॥
(ভা: ১১/৯)

বহু জন্মের পর প্রাপ্ত, বিশ্বে সুদূর্লভ, পরমার্থপ্রদ, এই অনিত্য মনুষ্যদেহ লাভ করে নিরন্তর মরণশীল দেহের পতনের পূর্বপর্যন্ত বুদ্ধিমান মানব কাল বিলম্ব না করে পরম মঙ্গলের নিমিত্ত যত্ন করবেন। বিষয়ভোগ সর্বত্র অর্থাৎ পশুযোনিতেও লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু মানব জন্ম ভিন্ন পরমার্থ লাভের আর কোনই সম্ভাবনা নেই।

আমাদিগকে এইজন্য মায়াদেবীর নিকট Resignation letter পাঠিয়ে তার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে কৃষ্ণের চাকুরীর Joining letter-এ স্বাক্ষর করতে হবে। আমরা আমাদের ক্ষণভঙ্গুর জীবনের বহুকাল ব্যয় করেছি। পিতামাতার সন্তুষ্টীতে, পত্নীর মনোরঞ্জনে, পুত্রের প্রত্যাশা পূরণে, স্বজনের প্রীতিতে, বন্ধুর সৌহার্দ্যে, দেশ, জাতি ও সমাজের লোকের সেবায়।

মিথিলার রাজকবি তাই বলেছেন-

আধ জনম হাম নিদে গোয়াইলুঁ জরা শিশু কতদিনে গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতলু তোহে ভজব কোন বেলা ॥

আয়ুর অর্ধকাল কেটে গেল মিছা নিদ্রার বশে; বাল্যকালে আরও কতদিন নষ্ট হল, যৌবনের ভারে অহংভাবে নিজকে ভোক্তা আর জগতকে ভোগ্য মনে করে সংসার প্রতিপালন করলাম। এতদৃশরূপে জনম যখন ক্ষনকাল বাকী, বার্ধক্যে শরীর জরজর তখন কোথায় গেল সেসব সুসময়ের বন্ধুগণ, আমার উপকারীর বেশে হন্তাবন্ধুগণ? তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মনোকষ্টে গেয়েছিলেন-

বৃদ্ধকাল আওল সব সুখ ভাগল পীড়াবশে হইনু কাতর।

তারপর কোন স্বল্প সুকৃতিবান ব্যক্তি কৃষ্ণ ভজনের দুরাশা পোষণ করেন, যদিও তখন জীবন শমনরাজের Death Sentence -এর সন্নিকটে দন্ডায়মান। কিংবা মায়াপহৃতজ্ঞান গর্দভসদৃশ মানুষেরা তখনও কৃষ্ণস্মৃতিতে পুনর্জাগরিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন না। তারা জাগতিক অর্থ সম্পদে বলীয়ান হয়ে নিজদিগকে প্রতাপশালী মনে করে, যমরাজের কবল হতে মুক্ত ভেবে রৌরবে যাবার ব্যাপারটা আরও সুদৃঢ়ভাবে Contract করে থাকেন। তাদের নিমিত্তে পদকর্তা জানিয়েছেন।

কুলধন পাইয়া উনমত হইয়া আপনাকে জান বড়
শমনের দূতে ধরি পায়ে হাতে বান্ধিয়া করিবে জড়।।
দাস লোচন ভাবে অনুক্ষণ মিছাই জনম গেল।
হরি না ভজিলু বিষয়ে মজিলু হৃদয়ে রহল শেষ।।

হরিভজনের সময় নাই বলে কোলাহল তুলি। কিন্তু আর কতকাল এভাবে লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে নিজকে রক্ষা করব। একদিন ঠিকই মক্ষিকার উক্তির ন্যায় যমদূত আমার মস্তক নারকেল ভাঙ্গা করবে। শেষকালে নিজের মাথা নিজেই খাব।

সংসার ভজিলি শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি না শুনিলি সাধুর কথা।

ইহ পরকাল দু'কাল খোয়ালি খাইলি আপন মাথা।।

তাই হে বিষয়ীগণ, এখনও সাবধান হও। স্মরণ রাখিও-

শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে

এই মায়াময় অসার সংসার হতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হরিভজন। এই জগতে আমরা দেখতে পাই এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে অচল, তেমনি এই জগতের প্রাপঞ্চিক অর্থ দ্বারা কখনই ভগবানের রাজ্যে ফিরে যাওয়া যায় না। Money Changer-এ যেরূপ অর্থ বিনিময় করা হয় তদ্রুপ কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন রূপ Money Changer-এ জাগতিক অর্থসম্পদ দান করে সাধু গুরুর কৃপা ও হরিনাম গ্রহণ করে জাগতিক অর্থকে পরম অর্থে পরিণত করতে হবে। অর্থাৎ এই সংসারের সদস্য পদে Resign দিয়ে কৃষ্ণ সংসারের সদস্য হতে গেলে হরিনামরূপ পাসপোর্ট ও কৃষ্ণ সেবারূপ ভিসা গ্রহণ করতে হবে। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন –

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

অর্থাৎ এই জগতের অর্থবিত্তাদি ত্যাগ না করে অনাসক্তভাবে তাহা দ্বারা ভোগের জনক মাধবের সেবাবিধান করবার নামই যুক্তবৈরাগ্য। আর তাতেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রীতি।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান ॥

আমরা ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ। কৃষ্ণই আমাদের পরম আশ্রয়, পরম ধাম, পরম সুহৃদ, পরম প্রেমিক। কৃষ্ণ আমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয় পরিজন সকল কিছু। ইহা ভুলিয়াই আমাদের যত বিপত্তি ঘঠছে।

তুমি মোর চিরসাথী, ভুলিয়া মায়ার লাথি খাইয়াছি জন্ম-জন্মান্তর

তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর খেদোক্তি করেছেন–

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেমরতন ধন হেলায় হারাইনু ॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু ॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু। গৌর কীর্তন রসে মগন না হইনু ॥
এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কান্দিল মন। মনুষ্য দুর্লভ জন্ম গেলা অকারনে ॥

কিন্তু অদ্য যদি আবারও কৃষ্ণ সঙ্গে আমাদের পুনসংযোগ হয় তবেই তো এ মানব জনমের সার্থকতা। প্রকৃত সুখ, পরম প্রাপ্তি।

আজি পুনঃ এ সুযো া যদি হয় যোগাযোগ
তবে পারি তুহে মিলিবারে ॥

কৃষ্ণপ্রেমই সেই পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ। এই কৃষ্ণপ্রেমের মাধ্যমে আমরা আবারও ফিরে যেতে পারি, কৃষ্ণলোকে-ব্রজেশ্বর মাধব ধামে। ●

(৩৩পৃষ্ঠার পর)

পারা ভাল, অনেক মন্দিরের প্রথা আছে-আরতির বিঘ্ন না ঘটিয়ে অর্ঘ্য জল এবং পুষ্পাদি আরতির শেষে শঙ্খধ্বনির পরে বিতরিত হয়ে থাকে।

ধুপ, অর্ঘ্য, বস্ত্র, এবং পুষ্পাদি সময়াভাবে কমসংখ্যক চক্রাকারে প্রদর্শন করাও চলে। আরতি অনুষ্ঠানের মূল উপকরণ হল দীপ, যার জন্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক চক্রাকারে প্রদর্শনের বিধি রয়েছে। সাধারণত, অর্ঘ্য নিবেদনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক চক্রাকারে তা প্রদর্শনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না।

প্রত্যেকটি উপচার নিবেদনের সময় হিসাব করে নেওয়ার চেষ্টা করতে হয়, যাতে আরতি সমাপনের আগে বেশ কিছু বার চামর এবং পাখা মনোরমভাবে নিবেদনের সময় পাওয়া যায়।

প্রচলিত প্রথানুসারে, মন্দিরের পিছনদিকে দণ্ডায়মান গরুড়ের কাছেই প্রথমে দীপ নিবেদন নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে। ইসকনের মন্দিরগুলিতে দীপ নিবেদন প্রথমে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের কাছেই প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়, যেহেতু তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। অল্পক্ষণের জন্য দীপটি শ্রীল প্রভুপাদের স্পর্শের জন্য তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে (আরতির মতো সেটি চক্রাকারে নিবেদিত হবে না), দীপটিকে সমবেত বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে প্রবীণতা অনুসারে পরপর নিয়ে যাওয়া উচিত। (রজঃস্বলা মহিলাদের পক্ষে দীপ স্পর্শ করা অনুচিত।) প্রসাদ-দীপ নিয়ে যে ব্যক্তি সকলের কাছে নিবেদন করতে থাকবেন, স্পর্শ করার জন্য, তাঁকে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মাঝে প্রবীণদের প্রতি সজাগ থাকতে হবে, অবশ্য সমবেত ভক্তগণ দীপ নিবেদনের সময়ে ঘটনাক্রমে বঞ্চিত হলে ব্যথিত হওয়া অনুচিত। আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য ঐ দীপ কাছে আনা হয় না, বরং শ্রীভগবানের প্রসাদরূপে ঐ দীপশিখা স্পর্শ করার পরে তা আমাদের কপালে দু'হাত দিয়ে তুলে নিয়ে আমরা শ্রীভগবানের দীপ-প্রসাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপনের সুযোগ লাভ করে থাকি।

আরতি সমাপন

চামর ব্যজন পাখা এবং আরতির আগে ও পরে শঙ্খধ্বনি সমেত সম্পূর্ণ আরতি পচিশ মিনিট পর্যন্ত চলতে পারে, সংক্ষিপ্ত আরতির সময় (যেখানে ধূপ, ফুল আর চামর নিবেদিত হয়ে থাকে) পাঁচ থেকে আট মিনিট হয়।

আরতি সমাপন হলে, শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে, আরতি আরম্ভের মতোই, তিনবার শঙ্খধ্বনি করতে হয়। তারপরে অর্ঘ্য এবং পুষ্প প্রসাদ সমবেত ভক্তজনের মধ্যে বিতরণ করা চলে। যদি মন্দিরের কীর্তন পরিচালক কিংবা অন্য কোনও ভক্ত প্রেমধ্বনি মন্ত্রাবলী উচ্চারণ না করেন, তবে পূজারী তা উচ্চারণ করে দেন।

তারপরে করজোড়ে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিনম্রভাবে প্রনাম প্রার্থনা নিবেদন করতে হয়।

অতঃপর শ্রীবিগ্রহকক্ষ থেকে আরতিপরিকরাদি সরিয়ে দিয়ে, সেই জায়গাটি এবং উপকরনাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, সবশেষে শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে এসে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করা বিধেয়। ●

‘দি সায়েন্টিফিক বেসিস অব কৃষ্ণ কন্‌সাসনেস’

ডঃ স্বরূপ দামোদর স্বামী কর্তৃক লিখিত

অনুবাদক ঃ শ্রী প্রনব সরকার

মহান পারমার্থিক গুরুর নির্দেশনা প্রসঙ্গে

যখন কেউ প্রকৃত পারমার্থিক জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হন, তখন তাঁর অজ্ঞানতা দূর হয়- ঠিক দিবালোকে সূর্য যেমন সবকিছুকে আলোকিত করে, তেমনি তাঁর জ্ঞানালোকও সবকিছুকে প্রকৃতভাবে প্রকাশিত করে থাকে।

আর এ বিষয়ে আমরা প্রশ্নাতীতভাবে বলি যে, কোন ডাক্তার, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা অন্য কোন বিশ্বপ্রেমিক আমাদের জীবনের সাময়িক সমস্যাগুলির সমাধান করে দিতে পারবেন। যেমন- জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধাবস্থায় শারিরীক অসুস্থতা ইত্যাদি। আমাদের এই জড় দেহটির যে কোন সময়ে মৃত্যু হতে পারে, সে কারণে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত হবে, এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য তৈরী হওয়া। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রকৃত পারমার্থিক ধারনা ব্যতীত অর্থাৎ প্রকৃত আধ্যাত্মিক গুরুর বিশেষ কৃপালব্ধ জ্ঞান ছাড়া কি করে একজন মানুষ সেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে পারে? পরীক্ষিত মহারাজ ভগবানের পরম ভক্ত, যিনি মৃত্যুর জন্য দীর্ঘ সাতদিন পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহন করেছিলেন। কিন্তু আমরা কেউই শুধু মাত্র সাত মিনিট পূর্বেও সে সম্পর্কে বলতে পারিনা। পরীক্ষিত মহারাজ সেই সাত দিন মহান ঋষি শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলামৃত শ্রবন করে নিজেকে ধন্য করেছিলেন। এভাবে পরীক্ষিত মহারাজ তাঁর জীবনকে অপ্রাকৃতভাবে ধন্য করেছিলেন। জড় জাগতিক-বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগন কখনও তাদের ছাত্রদের পারমার্থিক জ্ঞান দান করতে পারেন না। অর্থাৎ তাদের সে ধরনের কোন পারমার্থিক জ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে একজন পারমার্থিক গুরু যিনি শতভাগ কৃষ্ণভাবনামৃত দ্বারা পরিপুষ্ট, তিনি তাঁর শিষ্যদের পারমার্থিক বিষয়ে জ্ঞান দান করতে সমর্থ এবং জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান দিতে পারেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ সত্য, যিনি অবশ্যই পূর্ণ সত্যের ভিত্তি থেকেই অবতীর্ন হন। আর এই সত্যকে উপলদ্ধি করার জন্য কখনও আরোহ পদ্ধতির প্রয়োজন পড়ে না। আদি পুরানাদিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা অর্জুনকে বলেছিলেন, যে কেউ আমার ভক্ত দাবী করবে- তা কিন্তু কখনও নয়, পক্ষান্তরে যে আমার ভক্তের অনুসারী সেই আমার প্রকৃত ভক্ত বলে দাবী করতে পারেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুও তদ্রুপ বলেছেন, আমি ব্রাহ্মন নই, ক্ষত্রিয় নই, গৃহস্থ নই, আমি বানপ্রস্থও নই। আমি শাস্ত্রীয় বর্নাশ্রম ধর্মের আটটি শ্রেণীর অন্তর্গত নই, আমি দাসের অনুদাস তারও অনুদাস। এ কারনেই প্রকৃত সদগুরু হচ্ছেন, স্বচ্ছ মাধ্যম যার সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৌঁছানো সম্ভব। শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর যিনি একজন মহান আচার্য্য, তিনি সদগুরুর গুন কীর্তন করেছেন।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

যদি কোন ভক্ত তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেবের তুষ্টি সাধন করতে পারেন, তাহলে তিনি অবশ্যই ভগবানের কৃপা লাভ করবেন। সুতরাং কোন ভক্ত যদি গুরুদেবের তুষ্টি বিধান করতে অপারগ হন, তাহলে তিনি অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃতের আসনে উন্নতি লাভ করবেন না। অতএব আমাদের উচিত হবে, তাঁর ধ্যান করা। গুরুকৃপা লাভের জন্য দিনে তিন বার তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করা এবং তাঁর শ্রীচরণ কমলে, যাতে ভক্তিলতা বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়, সেই ভক্তিপূর্ণ প্রনাম নিবেদন করা উচিত। আর এটাই হচ্ছে মহান বৈষ্ণব আদর্শ। আর ভক্তের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে, সবসময়ে কিভাবে গুরুদেবের তুষ্টি সাধন করা যায় সেই চেষ্টা করা।

সুতরাং প্রত্যেক ভক্তের উচিত হবে, কিভাবে গুরুদেবের আদেশ পালন করা যায় এবং কোন প্রকার ব্যক্তি স্বার্থের চিন্তা না করে তা প্রতিপালন করাই হচ্ছে প্রকৃত আদর্শ।

— চলবে।

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর
2005
রগুলি একাদশীর তারিখ ❊ ইস্‌কন মুখপত্র ত্রৈমাসিক 'অমৃতের সন্ধানে' পত্রিকা

July

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

August

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

September

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

October

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

November

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

December

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

তের সন্ধানে' পত্রিকাটি নিজে পড়ুন এবং অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন ।

গঙ্গানদীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য

– শ্রীমুরারিগুপ্ত দাস ব্রহ্মচারী।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তিজাত চিন্ময় জগৎ হচ্ছে– ত্রিপাদ বিভূতি সমন্বিত, আর ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তিজাত এই জড় জগৎ হচ্ছে– একপাদ বিভূতি সমন্বিত। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের মধ্যস্থলে রথোপবিষ্ট অর্জুনের মোহভঙ্গ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বিভূতি বর্ণনা করছিলেন, তখন তিনি সর্বশেষে বলেছিলেন–

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

"হে অর্জুন ! অধিক আর কি বলব, এইমাত্র জেনে রাখ যে, আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।" (গীতা ১০/৪২)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ বিভূতি বলতে বুঝায় অশোক, অমৃত ও অভয়। চিন্ময় জগৎ হচ্ছে শোকহীন, সেখানকার সব কিছু অমৃতময় এবং ভয়শূন্য। কিন্তু একপাদ বিভূতি এই জড় জগৎ হচ্ছে দুঃখালয় এবং এখানকার সব কিছু মরীচিকাবৎ মায়াময় অর্থাৎ অনিত্য। জড় জগৎ বলতে বুঝায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ডের সমষ্টি। এই জড় জগৎ হচ্ছে সনাতন চিন্ময় জগতের বিকৃত প্রতিফলন। প্রতিফলনের অস্তিত্ব যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনই এই জড় জগতের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী। ব্রহ্মার একশো বছর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি। তারপর ব্রহ্মার মুক্তিতে এই জড় ব্রহ্মাণ্ডটি অপ্রকটিত অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ, এই জড় ব্রহ্মাণ্ডটি মহৎ-তত্ত্বে পরিণত হয় এবং মহৎ-তত্ত্ব প্রধানে বা অব্যক্ত প্রকৃতিতে পরিণত হয়।

প্রকৃতপক্ষে এই মহৎ-তত্ত্ব থেকে অনন্ত কোটি জড় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি আঙ্গুর ফলের একটি থোকার মতো পরস্পর অবস্থান করে। এই মহৎ-তত্ত্ব প্রকাশিত হয় চিদাকাশের একটি ক্ষুদ্র অংশে, ঠিক যেমন এখানকার আকাশের একটি ক্ষুদ্র অংশে এক ফালি মেঘের সৃষ্টি হয়। চিৎ-জগৎ ও জড় জগতের মধ্যখানে অবস্থিত কারণ-সমুদ্রে শায়িত প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু যখন মহৎ-তত্ত্বের প্রতি ঈক্ষণ করেন, তখন পুনরায় পূর্বের মতো এই জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলি পুনঃপুনঃ প্রকাশিত হয়,এভাবেই অনন্ত কোটি জড় ব্রহ্মান্ডগুলি পুনঃপুনঃ প্রকাশিত হয়, আবার পুনঃপুনঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই এই জড় জগতের অস্তিত্ব অস্থায়ী, কিন্তু মিথ্যা নয়-যা মায়াবাদী বা মুমুক্ষুরা বলে থাকে।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের ব্রহ্মান্ডগুটি সবচেয়ে ক্ষুদ্র এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক–ব্রহ্মা চতুর্মুখ-বিশিষ্ট, আর এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে, সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক ব্রহ্মারা লক্ষ-কোটি মুখবিশিষ্ট। চতুর্মুখ ব্রহ্মা আমাদের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটিকে চৌদ্দটি ভুবনে বিভক্ত করেছেন। আমরা যে ভুবনে বসবাস করছি, তার নাম ভূলোক বা মর্ত্যলোক এবং এটি এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে অবস্থিত। স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন ব্রহ্মার অনুরোধে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করছিলেন, তখন তিনি রাতকে দিনে পরিণত করবার অভিপ্রায়ে এক উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রথে সূর্যদেবের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তখন রথের চাকার দ্বারা যে খাত সৃষ্টি হয়েছিল, তা সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয় এবং তার ফলে ভূমণ্ডল সপ্তদ্বীপে বিভক্ত হয়েছিল। এই সপ্তদ্বীপ হচ্ছে-জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এবং এক-একটি দ্বীপ এক-একটি সমুদ্রের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই সাতটি সমুদ্র হচ্ছে-লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও শুদ্ধ পানীয় জল। জম্বুদ্বীপের বিস্তার আট লক্ষ মাইল এবং তাকে বেষ্টন করে আছে যে লবণ-সমুদ্র তারও বিস্তার সমপরিমাণ। এভাবেই পরবর্তী দ্বীপটি আগেরটি অপেক্ষা দ্বিগুণ। তেমনই, পরবর্তী সমুদ্রটি আগেরটি অপেক্ষা দ্বিগুণ।।

মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথের দ্বারা সৃষ্ট সাতটি সমুদ্রের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ লবণ-সমুদ্রের বিস্তার হচ্ছে আট লক্ষ মাইল এবং পরবর্তী সমুদ্রগুলি পূর্বটি অপেক্ষা দ্বিগুণ। জম্বুদ্বীপ নয়টি বর্ষ দ্বারা বিভক্ত এবং এই বর্ষগুলি হচ্ছে-ভারত, কিম্পুরুষ, হরি, কুরু, হিরন্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, ও কেতুমাল। জম্বুদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত, তাই আমরা জম্বুদ্বীপের অধিবাসী। এই জম্বুদ্বীপকে বেষ্টন করে আছে লবণ-সমুদ্র, যার বিস্তার এক লক্ষ যোজন বা আট লক্ষ মাইল। জম্বুদ্বীপের মধ্যখানে রয়েছে ইলাবৃতবর্ষ, যার মধ্য থেকে সুউচ্চ সুমেরু পর্বত উত্থিত হয়েছে এবং এর উচ্চতা এক লক্ষ যোজন বা আট লক্ষ মাইল। তাছাড়া সুমেরু পর্বতের চতুর্পার্শ্বে অসংখ্য পর্বতমালা রয়েছে এবং কোন কোন পর্বত আশি হাজার মাইল উচ্চ। হিমালয়, গন্ধমাদন, হেমকূট আদি বহু সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে বহু জলস্রোত প্রবাহিত হয়ে ভারতবর্ষে বহু নদ-নদীর সৃষ্টি হয়েছে।

মহারাজ সগর যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র সেই যজ্ঞের ঘোড়া অপহরণ করেন। তখন সগরের প্রথম রাণীর গর্ভজাত ষাট হাজার পুত্রসন্তান সেই অশ্বের সন্ধানে অবনীতল খনন করেছিলেন। তখন তাঁরা ভগবানের অবতার কপিল মুনির আশ্রমের নিকটে ঘোড়াটিকে খুঁজে পান এবং কপিল মুনি এই ঘোড়া অপহরণ করেছেন, এই দুর্বুদ্ধির ফলে তাঁর দেহজাত অগ্নিতে তারা ভস্মীভূত হন।

মহারাজ সগরের দ্বিতীয় রাণী কেশিনীর পুত্রসন্তানের নাম ছিল অসমঞ্জস এবং তাঁর পুত্রের নাম ছিল অংশুমান। তিনি তাঁর পিতামহ সগরের নির্দেশে যজ্ঞের অশ্বটিকে খুঁজতে গিয়ে কপিল মুনির আশ্রমের সন্নিকটে তাঁর

পিতৃব্যদের ভস্মরাশি ও সেই সঙ্গে অশ্বটিকে দেখতে পান। তখন তিনি ভগবান কপিলদেবের উদ্দেশ্যে তাঁর মহিমা কীর্তন করে বহু স্তবস্তুতি করেন। তাঁর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে কপিলদেব তাঁকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। তখন তিনি তাঁকে যজ্ঞের অশ্বটিকে নিয়ে যেতে বলেন এবং একমাত্র গঙ্গার পবিত্র জলের পরশেই তাঁর পিতৃব্যরা উদ্ধার পাবেন, সেই কথাও বললেন। অংশুমান অশ্বটিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে, মহারাজ সগর অবশিষ্ট যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত করেছিলেন। তারপর তিনি সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে ফিরে গিয়েছিলেন।

অংশুমান গঙ্গাকে আনতে অসমর্থ হন এবং তার পুত্র দিলীপ গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে আনবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন দিলীপের পুত্র ভগীরথ কঠোর তপস্যা করে গঙ্গাদেবীকে সন্তুষ্ট করলে, গঙ্গাদেবী ভগরথকে বর প্রদান করেন তখন ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য গঙ্গাদেবীর কাছে প্রার্থনা করেন। তখন গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে আসতে সম্মত হলেও দুটি শর্ত আরোপ করেন। প্রথম শর্ত হচ্ছে, আকাশ থেকে এই মর্ত্যলোকে পতিত হবার সময় কে তাঁর বেগ ধারণ করবে, তা না হলে তাঁকে পাতালে প্রবেশ করতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, এই পৃথিবীতে পতিত হলে সমস্ত পাপীরা স্নান করে তাদের পাপ স্খালন করবে, তাহলে তিনি সেই পাপরাশি থেকে কিভাবে মুক্ত হবেন?

গঙ্গাদেবীর প্রশ্নের উত্তরে ভগীরথ বলেছিলেন যে, শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই বিরাজ করেন। তাই তারা যখন গঙ্গায় স্নান করবেন, তখন পাপরাশি বিদুরিত হবে। আর দেবাদিদেব শিব হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার, তিনিই গঙ্গার বেগ ধারণে সমর্থ। তখন গঙ্গাদেবী মহারাজ সগরের ষাট হাজার ভস্মীভূত পুত্রদের উদ্ধারের জন্য এই মর্ত্যলোকে আসতে রাজি হন। আকাশ থেকে গঙ্গা যখন পৃথিবীতে পতিত হচ্ছিল, তখন শিব তাঁর জটাজালে সেই জল ধারণ করে নিজেকে পবিত্র করেছিলেন। ভগীরথ দ্রুতগামী রথে আগে গমন করলেন এবং মা গঙ্গা তাঁকে অনুসরণ করে বহু দেশ পবিত্র করে, যেখানে সগর-পুত্রদের ভস্ম ছিল, সেখানে এসে উপনীত হন। তখন গঙ্গাজলের পরশে ভস্মীভূত পুত্ররা মুক্ত হয়ে স্বর্গে গমন করেছিলেন।

কেবলমাত্র গঙ্গাজলের পরশে মহারাজ সগরের ষাট হাজার ভস্মীভূত পুত্রসন্তান মুক্ত হয়ে স্বর্গে গমন করেছিলেন। তা হলে যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে মা গঙ্গার পূজা করেন, তাঁদের যে কি লাভ হবে– তা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। গঙ্গা যেহেতু ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্ম হতে উদ্ভূত হয়েছে, তাই গঙ্গার এমন মহিমা। যাঁরা সতত গঙ্গার ধ্যান করেন, তাঁরা যে মুক্ত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। গঙ্গা অপবিত্রতানাশক। গঙ্গায় থুথু নিক্ষেপ করা, শৌচ করা, লম্পঝম্প করা অথবা গায়ে সাবান মাখা মহাপরাধ। এই জড় জগতের বদ্ধ জীবেরা নানাভাবে গঙ্গাকে অপবিত্র করে বলে মহাপ্রভুর এক মহান পার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দিনের বেলায় গঙ্গায় আসতেন না। তিনি রাতের বেলায় গঙ্গাকে দর্শন করতেন। পঞ্চ-মহাভূতের একটি উপাদান হচ্ছে জল। গঙ্গা কিন্তু এই জড় জগতের জল নয়। তাই গঙ্গার জলকে জলব্রহ্ম বলা হয়, কেন না তা চিন্ময়। এই জলের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে– কারণ সমুদ্র, যা জড় জগৎ ও চিন্ময় জগতের মধ্যখানে অবস্থিত। ভগবান বামনদেব যখন বলি মহারাজের যজ্ঞে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। বলি মহারাজ তা দিতে সম্মত হলে, তখন তাঁর দুটি পাদপদ্মের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল-এই ত্রিভুবন আবৃত করেন। তিনি তাঁর বাম পাদপদ্ম উর্ধ্বে নিক্ষেপ করলে, তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ হয়ে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। সেই ছিদ্র দিয়ে কারণ-সমুদ্রের চিন্ময় জল এই জড় জগতে পতিত হয়ে গঙ্গানদী সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান শ্রীবামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করে তাঁর পায়ের কুমকুমের সঙ্গে মিশ্রিত হবার ফলে গঙ্গার জল সুগন্ধীযুক্ত এক সুন্দর অরুণ আভা প্রাপ্ত হয়েছে।

কারণ-সমুদ্রের জল আকাশ-মার্গ দিয়ে পতিত হলে তা প্রথমে মহাদেবের জটাজালে পতিত হয়ে সহস্র যুগ ধরে সেখানে অবস্থান করে। তারপর সেই জল এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ধ্রুবলোককে প্লাবিত করে। তখন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ধ্রুব মহারাজ সেই জল মস্তকে ধারণ করে নানা রকম প্রেমভাব প্রকাশ করেন। তারপর গঙ্গার ধারা ধ্রুবলোকের নীচে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে প্লাবিত করে, তখন মরীচি আদি মহর্ষিরা সেই জলকে তাঁদের জটায় ধারণ করার ফলে তাঁদের ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় এবং তার ফলে তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম, এমন কি মোক্ষকে পর্যন্ত উপেক্ষা করেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলকে পবিত্র করার পর কোটি কোটি দিব্য বিমানে গঙ্গার পবিত্র জল নীচে অবতরণ করার সময় তা চন্দ্রলোককে প্লাবিত করে সুমেরু পর্বতের শিখরে অবস্থিত ব্রহ্মালয়ে নিপতিত হয়।

সুমেরু পর্বতের শিখরে গঙ্গার ধারা চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে, বিভিন্ন বর্ষের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পর্বতমালা অতিক্রম করে অবশেষে ভারতবর্ষে লবণ-সমুদ্রে পতিত হয়েছে। সীতা নামক ধারা ব্রহ্মপুরী থেকে নির্গত হয়ে কেশরাচল ও গন্ধমাদন পর্বত অতিক্রম করে ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্বদিকে লবণ-সমুদ্রে পতিত হয়েছে। তেমনই চক্ষু নামক গঙ্গার ধারাটি মাল্যবান পর্বতের শিখর থেকে জলপ্রপাত রূপে নিপতিত হয়ে কেতুমাল-বর্ষের মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে লবণ-সমুদ্রে পতিত হয়েছে। আবার ভদ্রা নামক গঙ্গার ধারাটি প্রথমে কুমুদ পর্বতের শিখর থেকে নীল পর্বতের শিখরে, সেখান থেকে শ্বেত পর্বতের শিখরে এবং তারপর শৃঙ্গবান পর্বতের শিখরে পতিত হয়। তারপর কুরুপ্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উত্তর দিকে লবণ-সমুদ্রে পতিত হয়। সেভাবেই, অলকানন্দা ধারাটি

ব্রহ্মপুরীর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বিভিন্ন পর্বতমালা অতিক্রম করে হেমকুট ও হিমকুট পর্বতশিখরে পতিত হয়। তারপর হিমালয় পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হরিদ্বার ও বিভিন্ন অঞ্চলকে প্লাবিত করে গঙ্গা দক্ষিণ দিকে লবণ-সমুদ্রে পতিত হয়েছে।

যাঁরা গঙ্গায় স্নান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাঁরা প্রতি পদে পদে অশ্বমেধ ও রাজসুয় আদি মহাযজ্ঞের ফল লাভ করতে পারেন। গঙ্গার জলে স্নান করার ফলে কেবল দেহের রোগই নির্মুক্ত হয় না, তাঁর হৃদয় সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে অনায়াসে তিনি ভগবৎ প্রেমভক্তি লাভ করতে পারেন। সাধারণ নদীর জলরাশির সমতুল্য মনে করে যারা গঙ্গার জলরাশিকে অপবিত্র করে, তারা গঙ্গাদেবীর চরণে মহাপরাধ করে এবং যথার্থ ফল লাভে বঞ্চিত হয়। কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রাঢ়দেশে বনে বনে ভ্রমণ করছিলেন, তখন কৃষ্ণনাম শ্রবণ না করতে পেরে মহাপ্রভু বলেছিলেন-

ভক্তিশূন্য সর্ব দেশ, না জানে কীর্তন।
কারো মুখে নাহি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ ॥
প্রভু বলে-"হেন দেশে আইলাম কেনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম কারো না শুনি বদনে ॥
কেনে হেন দেশে মুঞি করিলু পয়ান।
না রাখিমু দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১/৯৭-৯৯)

সেই সময় রাখাল বালকের মুখে হরিধ্বনি শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গী পার্যদদের জিজ্ঞাসা করলেন-

"দিন-দুই-চারি যত দেখিলাম গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিলুঁ হরিনাম ॥
আচম্বিতে শিশু-মুখে শুনি হরিধ্বনি।
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি ?"
প্রভু বলে,-"গঙ্গা কত দূর এথা হইতে ॥"
সবে বলিলেন,-"এক প্রহরের পথে ॥"
প্রভু বলে,-"এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার ॥
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা !
অতএব শুনিলাম হরি গুণ গাথা ॥"
গঙ্গার মহিমা ব্যাখা করিতে ঠাকুর!
গঙ্গা-প্রতি অনুরাগ বাড়িল প্রচুর ॥
প্রভু বলে,-"আজি আমি সর্বথা গঙ্গায়
মজ্জন করিব"-এত বলি' যায় ॥
যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি, -হেন অবতার ॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা-প্রতি স্তুতি।
তাঁর হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১/১০৩-১২৩)

গঙ্গার মহিমা কীর্তন করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন-

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ ॥

"যে শুদ্ধ ভক্ত তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, অর্থাৎ যিনি শুদ্ধ ভগবৎ-চেতনা লাভ করেছেন, তিনি প্রাকৃত দৃষ্টিতে কোন কিছু দর্শন করেন না। এই প্রকার ভক্তকেও প্রাকৃত দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত নয়। আপাতদৃষ্টিতে কোন শুদ্ধ ভক্তকে নীচ-কুলোদ্ভূত, কুৎসিত, বিকলাঙ্গ বা রোগগ্রস্ত বলে মনে হলেও তাঁকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে তার সেই দৈহিক ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি থাকতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনও তার দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়েন না। এটি ঠিক গঙ্গাজলের মতো। গঙ্গাজল যেমন কখনও কখনও বুদ্‌বুদ্, ফেনা বা পাঁকের দ্বারা ঘোলা হয়ে যায়, কিন্তু তা বলে গঙ্গার জল অপবিত্র হয়ে যায় না। যারা পারমার্থিক জীবনে উন্নত, তাঁরা গঙ্গাজলের গুণাগুণ বিচার না করেই পবিত্রতা লাভ করার জন্য সেই জলে স্নান করে থাকেন।"

(উপদেশামৃত ৬)

মহারাজ পরীক্ষিৎ সসাগরা পৃথিবীর রাজা ছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ঋষি-কুমারের অভিশাপ জানতে পেরে তিনি তাঁর সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মনকে একাগ্র করার জন্য সুরধুনী গঙ্গার তীরে প্রায়োপেবেশন করলেন। গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে শ্রীল সূত গোস্বামী বলেছেন-

যা বৈ লসচ্ছ্রীতুলসীবিমিশ্র-
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী।
পুনাতি লোকানুভয়ত্র সেশান্
কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমাণঃ ॥

"যে সুরধুনী শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু বিমিশ্রিত তুলসীদলের সংস্পর্শে সর্বোৎকৃষ্ট সলিলরাশি বহন করছে, যিনি মহাদেবের মতো দেবতাদের অন্তর ও বাহির উভয় পবিত্র করছেন, মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে কোন্ মানুষ সেই পবিত্র ভাগীরথীর সেবা না করবে ?" (ভাগঃ ১/১৯/৬)

প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করতে না পারলেও, প্রত্যেক একাদশী তিথিতে এবং জন্মাষ্টমী, গৌরপূর্ণিমা আদি বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ তিথিতে গঙ্গায় স্নান করা অসীম ফলদায়ক। গঙ্গানাম উচ্চারণ করা গঙ্গার জল স্পর্শ করা, পান করা এবং স্নান করার ফলে কেবল পাপমুক্তিই হয় না, শ্রীকৃষ্ণের চরণে শুদ্ধ ভক্তি লাভ হয়। গঙ্গাপূজা করা হলে, সমস্ত দেবতাদের পূজা করা হয়। "গঙ্গায় আমার মরণ হচ্ছে"-এরূপ সজ্ঞানে মৃত্যু হলে মানুষ মুক্তি লাভ করে থাকেন, তা না হলে ব্রহ্মালোকে গমন করেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। বৈদিক শাস্ত্রে গঙ্গার অজস্র মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ধন্যবাদ !

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

এই যুগের সমস্যাদির পারমার্থিক পর্যালোচনা

-শ্রীঅশ্বিনী কুমার সরকার

শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকে মহাজ্ঞানী গৌতম বুদ্ধের ধর্মসংস্থাপন

শ্রীমদ্ভাগবত হলো অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের এক মহা মূল্যবান গ্রন্থ। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দ্যেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ পুরাণ বলে সর্বমহলেরই স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণচরিত এবং তাঁর মথুরা ও বৃন্দাবনলীলা। তবে আজকের যুগে উল্লেখ করার মতো আর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ভাগবতে চোখে পড়ে, তা হলো মহাজ্ঞানী গৌতম বুদ্ধের আগমনের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ঃ

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জন সুতঃ কীকটেসু ভবিষ্যতি।।"

- অর্থাৎ, তারপর কলিযুগের প্রারম্ভে ভগবান ভগবদ্‌বিদ্বেষী নাস্তিকদের সম্মোহিত করার জন্য বুদ্ধদেব নামে গয়াপ্রদেশে অঞ্জনার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। সত্যি সত্যিই ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বুদ্ধদেব, ব্যাসদেব কর্তৃক ভাগবত রচনার প্রায় আড়াই হাজার বছর পর অঞ্জনার পুত্ররূপে (নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষতলে) গয়া প্রদেশেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, সনাতন ধর্মের অহিংসনীতির পুনরুজ্জীবন আর পাপাচারে লিপ্ত নাস্তিকদের পরিত্রাণের জন্য। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শ' বছর আগে যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মহামতি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে, সে পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবে সেই বেদের প্রসঙ্গই সামনে চলে আসে।

বেদ মূলত একটি। পূর্বে বেদ অখন্ডই ছিল। মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মানবজাতির বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতা লক্ষ্য করে সেই এক বেদকেই চার ভাগে বিভক্ত করেন- তার ভাব, ভাষা, ছন্দ, অর্থ, সূত্র ও বিষয়বস্তু অনুসারে। এই চার ভাগের নামকরণ করেন তিনি-ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদ নামে। এরপর তিনি পুরাণ এবং মহাভারতাদি বিবিধ মূল্যবান গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। বেদবিভাজন ও পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনার পর তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের তা পাঠ করে শোনান। তারপর তিনি ঋষি পৈল, জৈমিনী, বৈশাম্পায়ণ, সুমন্ত ও শুকদেবের ওপর তা প্রচার ও বিচার-বিশ্লেষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এভাবেই বেদ ও পুরাণ ভাষ্যাদি মানব সমাজে প্রচারিত হয়। এখানে বলা বিশেষভাবে দরকার যে, ব্যাস কর্তৃক বেদ বিভাজনের পরও বেদমন্ত্রের অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনের বিষয়টা সাধারণ মানুষের কাছে দুরূহই থেকে যায়। এ দুরূহ তত্ত্ব কেবল উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণদের পক্ষেই সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম ও বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব ছিল। কিন্তু এই কলিযুগের অধিকাংশ মানুষই অবিচক্ষণ ও অল্প জ্ঞানসম্পন্ন। এমনকি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত মানুষেরাও অনেকে শূদ্রের ন্যায় অল্পবোধ ও মেধাসম্পন্ন। যে যেমনভাবে বুঝেছেন, তেমনিভাবেই বেদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, উপস্থাপন এবং লোকসমাজে প্রচার করেছেন। এ কারণেই এক বেদ থেকে নানা ধরনের শাস্ত্র ও দর্শনের উদ্ভব হয়। কালের বিবর্তনে কোন কোন দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করা হয় এবং ওইসব দর্শনের উদ্ভাবকরা কেবল দেব-দেবীর পূজার্চনা, যাগ-যজ্ঞ আর নির্বিচারে পশুবলিকেই প্রকৃত ধর্মকর্ম বলে প্রচার করতে থাকে। আর দুর্বলচিত্ত ও মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা বিশ্বাস করতে থাকে যে, বেদের নির্দেশ অনুসারেই যাগ-যজ্ঞ ও পূজায় পশুবলি প্রদান করা হচ্ছে। ধর্মের নামে এভাবেই তখন বংশানুক্রমিক বর্ণভেদ (জাতিভেদ) মানা, নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা, মদ্য ও ধূমপান, মাংসাহার, মন্দিরে অশ্লীল (নগ্নচর্চা) মূর্তি-ছবির ব্যবহার আর খোলামেলা যৌনচর্চা (মুক্তাচার) মানুষের কাছে মুখ্য বিষয় হয়ে উঠে। এর ফলে ভারতবর্ষে ধর্মের পরাজয় শুরু হয় এবং অধর্মের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে। মানব সমাজ অরাজকতা, উচ্ছৃংখলতা আর অনৈতিকতায় পূর্ণ এক চরম সঙ্কটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। এ সঙ্কটময় মুহূর্তেই মানবজাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য মহামানব গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

ভাগবত ও কল্কিপুরাণে গৌতম বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলার বৈষ্ণব কবি জয়দেব দশাবতারের যে প্রশস্তি গেয়েছেন, তাতে বুদ্ধদেব নবম অবতার হিসেবে কীর্তিত হয়েছেন। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ দশাবতার স্তোত্রে ভগবানের নবম অবতাররূপে বুদ্ধদেবকে বন্দনা করেছেন যে ভাষায়, তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয় হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব-ধৃত বুদ্ধ শরীর! জয় জগদীশ হরে ॥"

-'হে কৃপাময় বুদ্ধ! যজ্ঞ প্রতিপাদক যে সকল বেদবাক্যে পশুহিংসা বিহিত হয়েছে, তুমি তার নিন্দা করেছ। হে কেশব, হে বুদ্ধরূপী, হে জগদীশ হরি, তোমার জয় হোক'। উল্লেখ্য, বেদের দু'টি কান্ড বা অংশ, যা কর্মকান্ড ও জ্ঞানকান্ড নামে পরিচিত। কর্মকান্ডে যাগযজ্ঞাদি সকাম অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিহিত;

আর জ্ঞানকাণ্ডে দার্শনিক চিন্তা, ধ্যানধারনা এবং উপাসনাদি বিহিত বলে গণ্য হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ পশুহিংসামূলক যাগযজ্ঞাদিবহুল সকাম কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। বুদ্ধদেব হিংসা জর্জরিত জগতের দিকে তাকিয়েছিলেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং মানুষ দুঃখের হাত থেকে কীভাবে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে, তার প্রকৃষ্ট পথ নির্দেশ করাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও ব্রত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্যাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান বিষয়; অতীন্দ্রিয় জগতের সমস্যা নিয়ে কথা বলার কোন আগ্রহ তাঁর ছিল না। অতীন্দ্রিয় জগৎসংক্রান্ত দশটি সমস্যার ব্যাপারে তাঁর কাছে প্রশ্ন তোলা হলে, তিনি সেগুলো নিষ্ফল ও অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করতেন। আর সৃষ্টিকর্তা আছেন কি নেই – এ প্রশ্নে তিনি সবসময়ই নীরবতা পালন করতেন। একারণে বুদ্ধদেবের দর্শনকে ব্যবহারিক পরিভাষায় 'প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এ মতবাদে পরমেশ্বর ভগবানকে এবং বেদের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু আসলে এটা ছিল নাস্তিক পশুহত্যাকারীদের বিমোহিত করে ভগবন্মুখী করার একটি ভিন্নতর ব্যবস্থা। এ নীতি অবলম্বন ছাড়া ঐ পরিস্থিতিতে নির্বিচারে পশুহত্যা রোধ করার অন্য কোন সহজ পথ খোলা ছিল না। বস্তুত তিনি ছিলেন বৈদিক 'সুর-দ্বিষ' বা অসুর এবং যারা বেদের অজুহাত দেখিয়ে নির্বিচারে গো-হত্যা অথবা যাগযজ্ঞে পশুবলি সমর্থন করতে চায়, তাদের সেই জঘণ্য হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ রোধ করার জন্যই বুদ্ধকে সর্বতোভাবে বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করতে হয়েছিল। তিনি তাঁর কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কেবল একাজটা করেছিলেন। তা না হলে তাঁকে ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করা হতো না; তা না হলে জয়দেবাদি বৈষ্ণব আচার্যগণ তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করতেন না। এখানে বলা দরকার যে, অদ্বৈত বেদান্তের শিক্ষার সাথে সম্যকসম্বুদ্ধের উপদেশের ঐক্যহেতুই শঙ্করাচার্যের পরমগুরু আচার্য গৌড়পাদ (৫৫০ খৃঃ) মান্ডুক্য কারিকায় বুদ্ধদেবকে এই বলে বন্দনা করেছেন–

"জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সংবুদ্ধ স্তংবন্দে দ্বিপদাং বরম্ ॥"

– 'যিনি আকাশ সদৃশ অথচ জ্ঞেয় (ব্রহ্ম) হতে অভিন্ন জ্ঞান দ্বারা গগন তুল্য অসীম ধর্মসমূহ অবগত হয়েছিলেন, সেই নরশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধকে আমি বন্দনা করছি'। অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার দ্বারা যিনি সনাতন ধর্মের উজ্জীবন সাধন করেছিলেন সেই আদি শঙ্করাচার্য অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে মহামানব গৌতম বুদ্ধের প্রশস্তি গেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যিনি মহীমন্ডলে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক প্রাণায়াম ও নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করতঃ যোগিগণের অগ্রগণ্য হয়ে কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই বুদ্ধ আমাদের চিত্তে প্রবুদ্ধ হোন।" (দশাবতার স্তোত্রম্, ৭ম শতাব্দী) ভগবানের নবম অবতার হিসেবে খ্যাত মহাজ্ঞানী বুদ্ধ বস্তুত বেদের দুর্বোধ্য- অথচ অপরিহার্য তত্ত্বসমূহ তৎকালীন মোহাচ্ছন্ন জনগণের বোধগম্যের উপযোগী করে প্রচার করেছিলেন এবং সেটা করেছিলেন তিনি বেদের যথার্থ সিদ্ধান্তসমূহ সুচারুরূপে বাস্তবায়নের জন্যই। পরবর্তী সময়ে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও ধর্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে যথার্থ পথ অনুসরণ করেছিলেন। এভাবে বুদ্ধদেব এবং শঙ্করাচার্য ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে হলেও ধর্মের মূল প্রবাহের গতি বৃদ্ধির মাধ্যমে ভগবৎ বিশ্বাসের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। বুদ্ধদেব বলতেন, "আমি ঋষি প্রবোদিত ধর্মই প্রচার করছি; যা মানুষেরা কালের বিবর্তনে ভুলে গিয়েছিল।" এখানে দেখা যায়, প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ' গড়ে তোলাও বৌদ্ধ সাধনার একটি লক্ষ্য ছিল। ধম্মপদে অন্তিম বাণীতে বুদ্ধদেব বলেছেন,

"পুব্বে নিবাসং যো বেদি সগ্গাপায়ং চ পস্সতি,
অথো জাতিক্ খয়ং পত্তো অভিঞ্ঞাবোসিতো মুনি,
সব্ব বোসিত বোসানং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।"

(ধম্মপদ ৪২৩)

-'যে মুনি পূর্বনিবাস বিদিত আছেন, যিনি (জ্ঞাননেত্রে) স্বর্গ-নরক প্রত্যক্ষ করেন, যার পুনর্জন্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, যার অভিজ্ঞা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যিনি সর্বাধিক পূর্ণতা অধিগত করেছেন, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি'। বুদ্ধদেব জন্মগত ব্রাহ্মণ্যপ্রথা মোটেই সমর্থন করেননি। তিনি বলেছেন,

"ন চাহং ব্রাহ্মণং ব্রুমি যোগিজং মত্তি সম্ভবং,
ভোবাদি নাম সো হোতি সচে হোতি সকিঞ্চনো,
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।"

(ধম্মপদ ৩৩৬)

-'যদি কেউ রাগদ্বেষাদি কলুষযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণী মাতৃসম্ভূত বলেই তাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না। সে কেবল ভোবাদি (ভোবাদি অর্থে–ও হে! আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে প্রণাম কর, কিছু দক্ষিণা দাও ইত্যাদি)। যদি অকিঞ্চন অর্থাৎ রাগাদি মলশূন্য এবং অনাদান অর্থাৎ, আসক্তি রহিত, তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করি'। তিনি আরও বলেছেন,

"নিধায় দন্ডং ভূতেষু তসেসু থাবরেসু চ,
যো ন হন্তি ন ঘাতেতি তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং।"

– 'আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি যিনি দন্ড পরিহারপূর্বক দুর্বল ও সবল সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসা আচরণ করেন এবং যিনি হত্যা করেন না বা হত্যার কারণও হন না'। ধম্মপদে দেখা যায়, বুদ্ধদেব তাঁর প্রচারিত ধর্মকে 'সনাতন ধর্ম' নামে অভিহিত করেছেন এবং এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গেও কথা বলেছেন।

"নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনান্তনো।"

(ধম্মপদ ৫)

-'জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়, এটাই সনাতন ধর্ম'।

সনাতন ধর্মের অনুসারী জনগণ গৌতম বুদ্ধকে অবতার হিসেবে গ্রহণ করলেও বুদ্ধানুসারীরা তাঁকে চিন্তাশীল, ধ্যানী-জ্ঞানী তথা মহাজ্ঞানী একজন মানুষ (মহাজন) হিসেবেই অভিহিত করেছেন। তবে এখানে এ প্রসঙ্গে গীতায় উল্লিখিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (অর্জুনের উদ্দেশ্যে) উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নেই। কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করলে সেই জ্ঞান স্বতঃই অন্তরে উদিত হয়। আর তুমি যদি সমুদয় পাপী হতেও অধিক পাপাচারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ তরণী দ্বারা সমুদয় পাপসমুদ্র অতিক্রম করতে সমর্থ হবে।" (তথ্যসূত্রঃ গীতা ৪/৩৬-৩৮) জগতে যারা আত্মজ্ঞানী তথা মহাজ্ঞানী,

তাঁদের কাছে জীবাত্মা ও স্বীয় আত্মা সবসময় অভিন্নই বোধ হয় (গীতা ৫/১৮, ১৮/৪২)। 'অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তার রূপ'। সে কারণে আত্মজ্ঞানী মহাজনরা নর ও নারীতে, মানুষ ও পশুতে কোন ভেদ দর্শন করেন না। কারণ আত্মাতে কোন লিঙ্গভেদ নেই। লিঙ্গভেদের ব্যাপারটা কেবল দৈহিক তথা শারীরিক। বুদ্ধদেব আত্মজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন বলেই মানুষ আর পশুপাখির মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেননি; আর সে কারণে প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধেও যথার্থরূপে সোচ্চার হতে পেরেছিলেন। সাত্ত্বিক গুণাবলীর আলোকে আলোকিত হয়ে পবিত্রচেতা মহাপুরুষ বুদ্ধ জীবের মুক্তির জন্য প্রকৃতপক্ষে এভাবে সনাতন ধর্মই প্রচার করেছিলেন। ওই সময় তাঁর প্রচারিত ধর্মমত এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে অভিভূত করেছিল যে, অন্যসব ধর্মমত তার প্রভাবে একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। সুদূর তিব্বত-চীন-জাপান-মঙ্গোলিয়া-আফগানিস্তানে বুদ্ধসন্ন্যাসীরা বুদ্ধের মৈত্রী ও অহিংসার বাণী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। একসময় বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই তাঁর প্রচারিত ধর্মমত সত্য ও শান্তির দিশারী বলে অন্তরে ধারণ করেছিলেন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম হিসেবে বহু শত বছর বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম বিশ্বে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছিল, যা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্তও অক্ষুন্ন ছিল।

মহাজ্ঞানী বুদ্ধ ধর্মসংস্থাপন করতে গিয়ে যে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা হলো (১) নীতি বা শীল, (২) একাগ্রতা বা ধ্যান ও (৩) জ্ঞান বা পান্না। বুদ্ধের পঞ্চশ্রেয়ো নীতি জগতে পঞ্চশীল নামে সমধিক পরিচিত। প্রথম শীলে অহিংসা তথা প্রাণিহত্যা না করার কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধের মতে যাদের ভেতর প্রাণ আছে তারাই প্রাণী। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষও এক ধরনের প্রাণী। মানুষের যদি বেঁচে থাকার অধিকার থাকে তবে অন্যান্য প্রাণীরও সে অধিকার রয়েছে। সুতরাং তাদের হত্যা করা যাবে না। দ্বিতীয় শীলে বুদ্ধ অপরের দ্রব্যের প্রতি লোভ সংবরণ করতে বলেছেন। দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা তথা চুরি করাকে বুদ্ধ ঘৃণ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছেন। তৃতীয় শীলে বুদ্ধ মিথ্যা কামাচার থেকে সকল প্রাণীকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। মিথ্যা কামাচার বলতে বুদ্ধ অবৈধ যৌনাচার তথা ব্যভিচারকে বুঝিয়েছেন। চতুর্থ শীলের মাধ্যমে বুদ্ধ মানবজাতিকে মিথ্যাভাষণ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। শঠতা, কপটতা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ইত্যাদি হীনতার নামান্তর। তাই এসব অপকর্ম থেকে মানুষকে সর্বতোভাবে বিরত থাকতে হবে। বাক্যে মানুষের জ্ঞান ও স্বরূপ ধরা পড়ে। তাই মানুষকে বাক্যে বিচক্ষণতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন। পঞ্চম শ্রেয়োনীতির মাধ্যমে বাস্তববাদী বুদ্ধ মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। মাদকদ্রব্য বলতে ঐ ধরনের দ্রব্যকেই নির্দেশ করে, যা সেবন করলে মানুষের সংজ্ঞা রহিত হয়, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় এবং মানুষ উন্মাদ হয়ে পড়ে। যেমন - মদ, গাঁজা, আফিম, ভাং, তামাক জাতীয় জিনিষকে আমরা এ জাতীয় দ্রব্য বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

মহাজ্ঞানী বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের প্রায় সর্বত্রই মৈত্রী ও করুণার বাণী ঘোষিত হয়েছে। তাঁর এ মৈত্রী ও করুণার বাণী যে কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, এ অমোঘ বাণী সমগ্র বিশ্বচরাচরের সব ধরনের প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানেই বুদ্ধদর্শনের স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব। খৃষ্টধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় জন পল এ যুগে বলে চলেছেন, "সন্ত্রাস ও সহিংসতাকে জয় করতে হবে ভালবাসা দিয়ে, হিংসার মাধ্যমে নয়।" কিন্তু একথা তো মহাজ্ঞানী বুদ্ধ খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের কয়েক শত বছর পূর্বেই বলে গেছেন। যীশু খৃষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' বছর আগে তথাগত বুদ্ধ যে ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা হলো - 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'। উল্লিখিত মন্ত্রের 'বুদ্ধ' কিন্তু কেবল গৌতম বুদ্ধ নন; পরবর্তীকালের জ্ঞানবান, মেধাবান তথা প্রজ্ঞাবানদেরকেও বোঝানো হয়েছে। ধর্মীয় ভাবচেতনা সমুন্নত রাখার জন্য বস্তুত এটার খুবই প্রয়োজন। প্রজ্ঞাবান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে জোরদার সঙ্ঘশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হলে কোন বাইরের শক্তি তথা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও যে প্রকৃত ধর্মভিত্তিক সমাজের প্রসার ঘটে, বর্তমান আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের অবস্থান ও কার্যক্রম থেকে তার প্রমাণ কিন্তু আমরা যথার্থরূপেই পাচ্ছি। সুতরাং মহাজ্ঞানী বুদ্ধের জীবনাচার ও উপদেশ থেকে যথাসময়ে সুশিক্ষা গ্রহণ করা হলে সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মাবলম্বী সমাজ এখনকার মতো চরম দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মুখোমুখি যে হতো না তা একরূপ নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

বর্তমানে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ঘাটতির ফলে মনুষ্যত্ব যেন শূন্যে পাড়ি জমিয়েছে। অন্যায়-অবিচার, ব্যভিচার-ধর্ষন, সন্ত্রাস-সহিংসতা, অমানবিক শাসন-শোষণ এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উগ্র ও নিষ্ঠুর বাসনা আজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনটাকে একেবারে কলুষিত করে ফেলেছে। মানুষ তার স্বীয় স্বার্থে অন্ধ হয়ে যত্রতত্র নির্মম ও বীভৎস হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এরূপ হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের মৈত্রী ও প্রেমের শিক্ষাকে ভুলে যাওয়ার কারণে। গৌতম বুদ্ধ রাজমহলের সর্বসুখ ও আরাম আয়েস বিসর্জন দিয়ে যে মহাসত্য আবিষ্কার করেছিলেন, তা তো কেবল নির্দিষ্ট কোন জাতি কিংবা মানবগোষ্ঠীর জন্য ছিল না, তা ছিল বিশ্বচরাচরের সকল প্রাণীর জন্য, সকল দেশের জন্য। তাই আজকের যুগের সীমাহীন সন্ত্রাস-সহিংসতা, নির্দয়তা-নিষ্ঠুরতা ও বর্বর নৃশংসতা বন্ধে বুদ্ধের শিক্ষারই সব থেকে বেশি প্রয়োজন। বিশ্বচরাচরের সকল প্রাণীর বাঁচার অধিকার ও মর্যাদাকে স্বীকার করে মহামানব বুদ্ধ সকল প্রাণীর প্রতি করুণা ও মমত্ববোধের যে অপার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তা-ই কেবল পাবে এই দ্বন্দ্বসংঘাতময় ও দুর্নিবার কলহপ্রিয় পৃথিবীকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করতে। ইস্কন বুদ্ধের সকল প্রাণীর প্রতি করুণা ও মৈত্রীভাব প্রদর্শনের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়নি। 'হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের' মধ্য দিয়ে সকল প্রাণীর প্রতি করুণা ও মৈত্রীভাব প্রদর্শনের কথাই ইস্কন বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ইস্কনের অহিংসবাদ বুদ্ধের অহিংসবাদ থেকে মূলত ভিন্ন কিছু নয়। উল্লেখ্য, এ অহিংসবাদ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও প্রচার করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ। ●

'শিখা-মাহাত্ম্য'

- ভক্তির আলো দাসী

'শিখা' বা 'চৈতন্য' বা 'টিকি' বৈষ্ণবগন কেন মস্তকে ধারন করেন, উহার তাৎপর্য্য কি, তাহা বর্ত্তমানকালে জনসাধারণ কিছুই অবগত নহেন, বরং সর্বদা উপহাস করতে চাহেন; কিন্তু এই শিখা যে বেদাদি শাস্ত্র-নির্দ্দেশিত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ-তাহাই এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো–

নিত্য পূর্ণ-চৈতন্যময়, আনন্দ ও প্রেমরসঘন শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি হতে সৃষ্ট জীব, মানবগন পরমেশ্বরের তটস্থাশক্তির প্রকাশ-স্বরূপ; কিন্তু তাহা হলেও একমাত্র এই মনুষ্য জন্মেই আত্মচেতনতা লাভ করে ভগবদ্ জ্ঞান-কৃপা ও চিদানন্দ লাভ করা যেতে পারে। ভগবান আনন্দ-প্রেমাদির ঘনীভূত মূর্ত্তি এবং প্রতিটি মানুষ ও জীব সকল শান্তি ও আনন্দ অন্তরে সর্বক্ষণ ইচ্ছা করেন, সুখ-দুঃখ বা সংসারের ঝামেলা প্রকৃতপক্ষে কেহই চাহেন না; কেবল মায়ায় মোহিত হয়ে সংসারের সুখ-দুঃখ লাভেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে থাকি। কিন্তু চিত্তের আকাঙ্খিত শান্তি-আনন্দ কি প্রকারে লাভ করা যায়, তাহার জ্ঞান বা চেতনা লাভ না হলে সেই নিত্য শান্তি-আনন্দ লাভ হতে পারে না। আমরা মায়িক গুনময়-জগতে সাধারণতঃ মায়াবদ্ধ হয়ে রয়েছি, তথাপি শ্রীগুরু ও শ্রীভগবৎ কৃপা ও স্বীয় চেষ্টা, সাধনাদি দ্বারা এই মনুষ্যজন্মেই মায়ামুক্ত হয়ে নিত্য আনন্দময় শ্রীভগবৎ জ্ঞান বা চৈতন্য লাভ করতে পারি। ইহার প্রমাণরূপে নিত্য কালই অসংখ্য সিদ্ধ সাধু-মহাপুরুষগণ জগতে বর্ত্তমান। নিত্য-সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে সেই চেতনা লাভের পথ নির্দ্দেশিত হয়েছে।

শাস্ত্রের নির্দ্দেশেই পুত্রকে বাল্য বয়সে গুরুগৃহে প্রেরণ করবার প্রথা এবং সে কারণেই পুত্রকে যজ্ঞোপবীত গ্রহন করতে হয়। 'যজ্ঞ' শব্দে আত্মোন্নতি মূলক কার্য ও 'উপবীত' শব্দে পৈতা। এই উপবীত বা পৈতা গ্রহণের পূর্বে শৈশবস্থার প্রথম হতেই 'শিখা' বা 'চৈতন্য' বা 'চুন্নী' বা 'চুটিয়া' রাখিবার নির্দ্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে। "চৈতন্য" বা "চেতনতা" শব্দে কোনও বস্তুর তাৎপর্য্য বা জ্ঞানকেই বুঝায়, উর্দ্ধগামী অগ্নির শিখার ন্যায় যে কোনও বস্তুর জ্ঞান বা চেতনাও উর্দ্ধগামী; যাহা মানবগণকে নিম্নস্তর হতে সর্বদা আত্ম চৈতন্যময় উর্দ্ধস্তরে লয়ে যায় এবং পরিশেষে ভগবৎ চেতনা প্রাপ্তি করিয়ে সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের পদতলে পৌঁছাইয়া দেয়। এই কারণেই 'চৈতন্য'-শব্দের শুদ্ধ শাস্ত্রীয় নাম শিখা। এরূপ গূঢ়ভাব ও অর্থপূর্ণ শিখার কথাই ব্রহ্মোপনিষদে- "যস্য জ্ঞানময়ী শিখা"॥ মহানির্বানতন্ত্রে ৮/২৫৮ নং শ্লোকে আছে- **"ব্রহ্মপুত্রি! ত্বং হি বলরূপা তপস্বিনী"** ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাপুষ্ট শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ প্রণীত, বৈষ্ণব ধর্ম-জগতের সর্ব বিধি নিষেধ সম্বলিত "শ্রীশ্রী হরিভক্তি বিলাস" শাস্ত্রে ৩য় বিলাস, ২৩৫নং শ্লোকে নির্দ্দেশিত হয়েছে–

ততশ্চাচম্য বিধিবৎ কৃত্বাকেশ প্রসাধনম।
স্বত্বা-প্রণব গায়ত্রো নিব গ্নীয়াচ্ছিখা দ্বিজঃ॥

অর্থাৎ- অনন্তর দ্বিজ ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দন্ত ধাবনান্তে আচমন করে পশ্চাদুক্ত বিধানে প্রসাধন পূর্বক ওঁকার ও গায়ত্রী স্মরন করে শিখাবন্ধন করবে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসারেই বালবস্থা হতেই প্রভাতে শৌচ-স্নানাদির পর গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারন পূর্বক শিখা বন্ধন করবার রীতি রয়েছে। গায়ত্রী মন্ত্রের শেষে- 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ', ইহার অর্থ "আমার সমগ্র বুদ্ধিকে তোমার দিকে প্রেরিত কর।"

সর্ব সৎগুনময় শ্রীভগবানের প্রতি অন্তর সংযোজিত করে স্বীয় জীবনের প্রতিদিনের প্রথম ভাগ হতে নিজেকে চালিত করবার ইহাই শাস্ত্রোল্লিখিত প্রথা। ইহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য এই যে, আমরা জীবনের প্রথম হতে এই পথে নিজেকে চালিত করবার অভ্যাস বা সাধনা করলে তবেই ক্রমে আত্মচেতন লাভ করে ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান উপলব্ধির সহিত নিত্য-শান্তি-আনন্দময় মায়াতীত জীবন লাভ করতে সমর্থ হব। এই জ্ঞান বা চৈতন্য লাভেই মানব জীবনের সার্থকতা।

ভ্রূযুগলের মধ্যভাগের ঠিক বিপরীত দিকে 'আজ্ঞাচক্র'-ইহাতে মনোলয় ও আত্মদর্শন হয়। এই কারণেই মস্তকের এই স্থানে জ্ঞান বা চৈতন্যের প্রতীক স্বরূপ 'শিখা' রাখবার নির্দ্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই তিনটি-আমাদের সূক্ষ্মদেহ। ইহাদের প্রধান-মন বর্ত্তমানে মায়িক গুনাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এই মায়িক বা অসৎ গুনাতীত হয়ে মন যখন পরা বা সৎগুন সম্পন্ন হয়, তখনই মস্তিষ্কের পূর্বোক্ত স্থানে 'আজ্ঞাচক্র' সক্রিয় হয় এবং তখনই আমাদের মনোদয় অর্থাৎ জড়গুনময় মনের ক্রিয়া শেষ হয়ে মানবগন সর্ববিধ ভগবৎ-সৎগুনময় হতে পারেন। ইহাই যৌগিক ভাষায় আত্মদর্শন এবং এরূপে আত্ম গুনময় হয়ে নিত্য শান্তি আনন্দময় লীলাযুক্তাবস্থা মানুষ লাভ করতে পারে, এই ভগবৎ চৈতন্যযুক্ত শান্তি বা আনন্দ লাভই প্রতিটি মানুষের কাম্যবস্তু ও ইহার প্রতীক বা চিহ্নরূপে মস্তকের এই স্থানে কেশগুচ্ছ বা 'শিখা' বা 'চৈতন্য' রাখবার নির্দ্দেশ হিন্দুশাস্ত্রে নিত্যকাল বর্ত্তমান।

মানব সমাজে 'জাতিচিহ্ন' রূপে পারসীদের যেমন দীর্ঘ শ্মশ্রু, গ্রীকদের মুন্ডিত মস্তক, হেটিটদের লম্বা বেনী, প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন চিহ্ন দেখা যায়; তদানুসারে মস্তকের শিখাকেও হিন্দু জাতির চিহ্ন বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বর্ণাশ্রম-বিচারে হিন্দু জাতির ব্রাহ্মন-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্র এই যে চারিবর্ণ, ইহাদের সকলেই শিখা ধারন করবেন। কিন্তু ব্রাহ্মনগনের বিশেষভাবে এই শিখা ধারন কর্ত্তব্য বলে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। কারণ সমাজের সকল পূজা পার্বনাদি সম্পাদন করবার অধিকার বিশেষভাবে ব্রাহ্মনগণেরই এবং তদানুসারে সকল পূজা পার্বন, শ্রাদ্ধ উপনয়নাদি সম্পাদনের পূর্বে শিখা বন্ধনের নির্দ্দেশও শাস্ত্রে রয়েছে। এই রূপে, শিখার নিগূঢ় তাৎপর্য্য বা মাহাত্ম্য অবগত হয়ে ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগন ও বৈষ্ণবগন শিখা ধারন করেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিকভাবেও উহার মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিকগন তাদের Phrenology বা মস্তিষ্ক বিদ্যায় বলেছেন–

মস্তকের ঐ স্থানে কেশগুচ্ছ রাখলে মস্তিষ্ক শীতল থাকে ও জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্য করে।

আমাদের শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্পদায়ের পূর্ব আচার্য্যগণের বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রসকল হতেই শিখা-সম্পর্কিত এই সকল কথা সংগৃহীত হল–

"স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়স্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী"

(ভাগঃ-৫/১৮/৯)

অর্থাৎ– 'সারা জগতের মঙ্গল হোক, খল ব্যক্তিরা অনুকূল হোক, সমস্ত জীবেরা ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করে শান্ত হোক। তাই আমরা যেন অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে সদা সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত থাকতে পারি। "হরে কৃষ্ণ" ●

শ্রীমদ্ভাগবত হল প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্যও উপস্থাপন করা হল। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রথম স্কন্ধ ঃ "সৃষ্টি"

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রী নারদ মুনির আবির্ভাব

শ্লোক ১৫

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচিঃ।
বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমন্ডলে॥ ১৫॥

সঃ- তিনি; **কদাচিৎ**-একদা; **সরস্বত্যাঃ**- সরস্বতীর তটে; **উপস্পৃশ্য**-প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে; **জলম্**-জল; **শুচিঃ**- পবিত্র হয়ে; **বিবিক্ত**-একাগ্র চিত্তে; **একঃ**- একাকী; **আসীনঃ**- উপবিষ্ট হয়ে; **উদিতে**-উদয় হলে; **রবি-মণ্ডলে**- সূর্যমণ্ডলে।

অনুবাদ

এক সময়ে তিনি (ব্যাসদেব) সূর্যোদয়ের সময় সরস্বতী নদীর জলে প্রাতঃস্নান করে একাকী উপবিষ্ট হয়ে ধ্যানস্থ হলেন।

তাৎপর্য

হিমালয়ের শিখরে বদরিকাশ্রমের পাশ দিয়ে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং, এখানে যে স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে বদরিকাশ্রমের শম্যাপ্রাস নামক স্থান, যেখানে শ্রীব্যাসদেব অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ১৬

পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে॥ ১৬॥

পরাবর-অতীত এবং ভবিষ্যৎ; **জ্ঞঃ**-যিনি জানেন; **সঃ**- তিনি; **ঋষিঃ**- ব্যাসদেব ; **কালেন**-কালক্রমে; **অব্যক্ত**- অপ্রকাশিত; **রংহসা**-মহান্ শক্তির প্রভাবে; **যুগধর্ম**-যুগোচিত ধর্ম; **ব্যতিকরম্**-ব্যতিরেক; **প্রাপ্তম্**-প্রাপ্ত হয়ে; **ভুবি**- পৃথিবীতে; **যুগে যুগে**-বিভিন্ন যুগে।

অনুবাদ

মহর্ষি বেদব্যাস এই যুগের ধর্ম-বিপর্যয় দর্শন করলেন। কালের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন যুগে পৃথিবীতে তা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ব্যাসদেবের মতো মহান্ ঋষিরা হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ, এবং তাই তাঁরা অতীত এবং ভবিষ্যৎ স্পষ্টরূপে দর্শন করতে পারেন। তাই তিনি কলিযুগের দুর্দশাগ্রস্ত ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পেরেছিলেন, এবং সেই জন্য এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের মানুষেরা যাতে পারমার্থিক জীবন লাভ করতে পারে, তার আয়োজন করেছিলেন। এই কলিযুগের মানুষেরা সাধারণত অত্যন্ত গভীরভাবে অনিত্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত। অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকার ফলে তারা দুর্লভ মানব জীবনকে সার্থক করে পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারে না।

শ্লোক ১৭-১৮

ভৌতিকানাং চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসং চ তৎকৃতম্।
অশ্রদ্দধানান্নিঃসত্ত্বান্দুর্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ॥ ১৭॥
দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্দধ্যৌ হিতমমোঘদৃক্ ॥ ১৮॥

ভৌতিকানাম্ চ- ভৌতিক বিষয়েরও; **ভাবানাম্**- কার্যকলাপ; **শক্তি-হ্রাসম্ চ**- স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস হলেও; **তৎ-কৃতম্**-তার দ্বারা কৃত; **অশ্রদ্দধানান্**-অবিশ্বাসীদের; **নিঃসত্ত্বান্**-সত্ত্বগুণের অভাবে ধৈর্যহীন; **দুর্মেধান্**- দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন; **হ্রসিত**- হ্রাসপ্রাপ্ত; **আয়ুষঃ**-আয়ুর; **দুর্ভগান্ চ**-ভাগ্যহীনও; **জনান্**-জনসাধারণ; **বীক্ষ্য**-দর্শন করে; **মুনিঃ**-মুনি; **দিব্যেন চক্ষুষা**-দিব্য দৃষ্টির দ্বারা; **সর্ব**-সমস্ত; **বর্ণাশ্রমাণাম্**-সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের; **যৎ**-যা; **দধ্যৌ**-চিন্তা করেছিলেন; **হিতম্**-মঙ্গল; **অমোঘ-দৃক্**-যিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানবান।

অনুবাদ

পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি তাঁর দিব্য দৃষ্টির দ্বারা এই যুগের প্রভাবে জড় জগতের অধঃপতন দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন যে, এই যুগের শ্রদ্ধাহীন জনসাধারণের আয়ু অত্যন্ত হ্রাস পাবে এবং সত্ত্বগুনের অভাবে তারা ধৈর্যহীন হয়ে পড়বে। তাই তিনি সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষের কি ভাবে মঙ্গলসাধন করা যায় সেই চিন্তা করলেন।

তাৎপর্য

কালের অদৃশ্য শক্তি এতই প্রবল যে, তা সব কিছুই বিস্মৃতির অতলে বিলীন করে দেয়। চতুর্যুগের শেষ যুগ কলিতে কালের প্রভাবে জড় জগতের সব কিছুর শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। এই যুগে মানুষের শরীরের স্থিতি ভীষণভাবে হ্রাস পায়, এবং তার স্মৃতিও অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে যায়। জাগতিক কার্যকলাপের তেমন অনুপ্রেরণা থাকে না। ভূমি অন্যান্য যুগের মতো খাদ্যশস্য উৎপাদন করে না। গাভীরা আর আগের মতো প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয় না। ফল-মূল এবং শাক-সবজির উৎপাদন অনেক কমে যায়, এবং তার ফলে মানুষ এবং পশু আদি সমস্ত জীবেরই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। জীবনধারণের উপযোগী এই সমস্ত বস্তুগুলির অভাব হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আয়ু হ্রাস পায়, স্মৃতি ক্ষীণ হয়, বুদ্ধি হ্রাস পায়, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার মিথ্যা আচরণে পূর্ণ হয়ে ওঠে ইত্যাদি।

মহামুনি বেদব্যাস তাঁর দিব্যচক্ষুর দ্বারা তা দর্শন করেছিলেন। জ্যোতিষী যেমন মানুষের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, অথবা জ্যোতির্বিদ যেমন সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণের দিন-ক্ষণ ঘোষণা করতে পারেন, তেমনই শাস্ত্র-জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্ত পুরুষেরা সমস্ত মানব সমাজের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারতেন। তাঁদের পারমার্থিক জ্ঞানের প্রভাবে তাঁরা তা দর্শন করতে পারতেন।

এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা, যাঁরা ছিলেন স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্ত, তাঁরা সর্বদাই জনসাধারণের মঙ্গল সাধনে উদ্‌গ্রীব থাকতেন। তাঁরাই হচ্ছেন জনসাধারণের যথার্থ বন্ধু। তথাকথিত সমস্ত জননেতা, যারা আদৌ জানে না যে, পাঁচ মিনিট পরে কি হবে, তারা জনগণের বন্ধু নয়। এই যুগে জনসাধারণ এবং তাদের তথাকথিত সমস্ত নেতৃবর্গ উভয়েই অত্যন্ত দুর্ভাগা, তারা পারমার্থিক জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং কলিযুগের প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন। তারা সর্বদাই বিভিন্ন রোগের দ্বারা আক্রান্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই যুগে বহু মানুষ যক্ষ্মা, ক্যানসার আদি দুরারোগ্য রোগের দ্বারা আক্রান্ত, কিন্তু পূর্বে এগুলি ছিল না, কেন না কালের প্রভাব তখন এত মর্মান্তিক ছিল না। এই যুগের দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মানুষেরা তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে অনিচ্ছুক, যাঁরা হচ্ছেন শ্রীল ব্যাসদেবের প্রতিনিধি এবং সমাজের সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মানুষদের মঙ্গল সাধনের পরিকল্পনায় সর্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সব চাইতে বড় দাতা হচ্ছেন তিনি, যিনি ব্যাস, নারদ, মধ্ব, চৈতন্য, রূপ, সরস্বতী প্রমুখ ভাগবতগণের প্রতিনিধিরূপে ভগবতত্ত্বজ্ঞান প্রদাতা। এঁরা সকলেই হচ্ছেন এক এবং অভিন্ন। তাঁদের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন, এবং তা হচ্ছে সমস্ত অধঃপতিত জীবকে উদ্ধার করে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শ্লোক ১৯

চাতুর্হোত্রং কর্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্।
ব্যদধাদ্‌যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্বিধম্ ॥ ১৯ ॥

চাতুঃ–চার; **হোত্রম্**–যজ্ঞাগ্নি; **কর্ম শুদ্ধম্**–কর্মের পবিত্রীকরণ; **প্রজানাম্**–জনসাধারণের; **বীক্ষ্য**–দর্শন করে; **বৈদিকম্**– বৈদিক নির্দেশ অনুসারে; **ব্যদধাৎ**–করেছিলেন; **যজ্ঞ**–যজ্ঞ; **সন্তত্যৈ**–বিস্তার করার জন্য; **বেদম্**-**একম্**–এক বেদকে; **চতুঃ-বিধম্**–চারটি ভাগে।

অনুবাদ

তিনি দেখলেন যে, বেদে নির্দেশিত যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বৃত্তি অনুসারে তার কার্যকলাপকে পবিত্র করা। এই প্রক্রিয়াকে সরলীকৃত করার উদ্দেশ্যে তিনি এক বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন, মানুষের মধ্যে তা বিস্তার করার জন্য।

তাৎপর্য

পূর্বে বেদ ছিল একটি এবং তার নাম ছিল যজুর্বেদ। তাতে চার রকমের যজ্ঞের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে তা আরও সহজভাবে অনুষ্ঠান করার জন্য বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, যাতে চার বর্ণের মানুষেরা তাদের বৃত্তি অনুসারে পবিত্র হতে পারে। ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব–এই চারটি বেদ ছাড়াও ছিল পুরাণ, মহাভারত, সংহিতা ইত্যাদি, যাদের বলা হত পঞ্চম বেদ। শ্রীল ব্যাসদেব এবং তাঁর শিষ্যরা সকলেই হচ্ছেন ঐতিহাসিক পুরুষ এবং তাঁরা ছিলেন কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন। পুরাণ এবং মহাভারত হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্যের বর্ণনা যা বেদের শিক্ষা বিশ্লেষণ করে। বেদের অঙ্গস্বরূপ যে পুরাণ এবং মহাভারত তাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া উচিত নয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে পুরাণ এবং মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে শাস্ত্রের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করার এটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ২০

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥ ২০ ॥

ঋগ্-যজুঃ-সাম-অথর্ব-আখ্যা–ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব নামক চারটি বেদ; **বেদাঃ**–বেদসমূহ; **চত্বারঃ**–চার; **উদ্ধৃতাঃ**–বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল; **ইতিহাস**–ইতিহাস (মহাভারত); **পুরাণম্ চ**–এবং পুরাণসমূহ; **পঞ্চমঃ**–পঞ্চম; **বেদঃ**– জ্ঞানের আদি উৎস; **উচ্যতে**–বলা হয়।

অনুবাদ

জ্ঞানের আদি উৎস বেদকে চারটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য এবং পুরাণে উল্লিখিত সত্য ঘটনার বর্ণনাগুলিকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।

শ্লোক ২১

তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষামুত ॥ ২১ ॥

তত্র-তারপর; ঋক-বেদ-ধরঃ-ঋক্‌বেদের অধ্যাপক; পৈল ঃ- পৈল নামক ঋষি; সামগঃ-সামবেদের অধ্যাপক; জৈমিনিঃ- জৈমিনি নামক ঋষি; কবিঃ-অত্যন্ত পারদর্শী; বৈশম্পায়ন-বৈশম্পায়ন নামক ঋষি; এব-কেবল; একঃ-একাকী; নিষ্ণাতঃ- বিশেষভাবে পারদর্শী; যজু-যাম্-যজুর্বেদের; উত-মহিমান্বিত।

অনুবাদ

বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করার পর, পৈল ঋষি হলেন ঋক্‌বেদের অধ্যাপক, জৈমিনি হলেন সামবেদের অধ্যাপক এবং বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের দ্বারা মহিমান্বিত হলেন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন বেদকে বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল যথাযথভাবে তাদের বিস্তার করার জন্য।

শ্লোক ২২

অথর্বাঙ্গিরসামাসীৎসুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ॥ ২২॥

অথর্ব-অথর্ব বেদ; **অঙ্গিরসাম্**-অঙ্গিরা ঋষিকে; আসীৎ-অর্পন করা হয়েছিল; **সুমন্তুঃ**- সুমন্তু মুনি নামে পরিচিত; **দারুণঃ**- অথর্ব বেদের প্রতি ঐকান্তিকভাবে অনুরক্ত; মুনি ঃ- মুনি; **ইতিহাস-পুরাণানাম্**-ঐতিহাসিক তথ্য এবং পুরাণসমূহের; **পিতা**-পিতা; মে- আমার; রোমহর্ষণ-রোমহর্ষণ ঋষি।

অনুবাদ

সুমন্তু মুনি অঙ্গিরা, যিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবাপরায়ণ ছিলেন, তাঁকে অথর্ব বেদ দান করা হয়েছিল, এবং আমার পিতা রোমহর্ষণ ঋষির হাতে পুরাণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ অর্পণ করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রুতিমন্ত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, অঙ্গিরা মুনি, যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে অথর্ব বেদের কঠোর তত্ত্বগুলি অনুশীলন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন অথর্ব বেদের অনুগামীদের নেতা।

শ্লোক ২৩

ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্নেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোহভবন্॥ ২৩॥

তে-তারা; **এতে**-এই সমস্ত; **ঋষয়ঃ**- তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা; **বেদম্**-বিভিন্ন বেদকে; **স্বম্ স্বম্**-নিজের নিজের বিষয়ে; **ব্যস্যন্**-প্রদান করেছিলেন; **অনেকধা**-বহু; **শিষ্যৈঃ**-শিষ্যদের; **প্রশিষ্যৈঃ**- প্রশিষ্যদের; **তৎ-শিষ্যৈঃ**- প্রশিষ্যদের শিষ্যদের; **বেদাঃ তে**- সেই সমস্ত বেদের অনুগামীদের; **শাখিনঃ**- বিভিন্ন শাখা; **অভবন্**-এইভাবে হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই সমস্ত তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরা বিভিন্ন বেদকে তাঁদের শিষ্য, প্রশিষ্য এবং প্রশিষ্যের শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন এবং এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় অনন্ত শাখায় বেদ-অনুশীলন শুরু হয়।

তাৎপর্য

জ্ঞানের আদি উৎস হচ্ছে বেদ। জাগতিক অথবা পারমার্থিক এমন কোন জ্ঞান নেই যা বেদ থেকে আসেনি। তারা কেবল বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত হয়েছে। আদিতে তা প্রদান করে গেছেন মহান্ তত্ত্বজ্ঞানী মুনিঋষিরা। অর্থাৎ, বৈদিক জ্ঞান বিভিন্ন পরম্পরায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করা হয়েছে। তাই কেউই দাবি করতে পারে না যে, বেদের আনুগত্য ছাড়াই সে স্বাধীনভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২৪

ত এব বেদা দুর্মেধৈর্ধার্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবং চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ॥ ২৪॥

তে-তা; এব-অবশ্যই; **বেদাঃ**- বেদ; **দুর্মেধৈঃ**-অল্প বুদ্ধিমান মানুষদের দ্বারা; ধার্যন্তে-উপলব্ধি করতে পারে; **পুরুষৈঃ**-মানুষের দ্বারা; **যথা**-যতখানি সম্ভব; **এবম্**-এইভাবে ; চকার-সম্পাদিত হয়েছে; **ভগবান**-শক্তিমান; **ব্যাস**-মহর্ষি বেদব্যাস; **কৃপণ-বৎসলঃ**-অজ্ঞানীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু।

অনুবাদ

এইভাবে অজ্ঞানীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু মহর্ষি বেদব্যাস বেদ সংকলন করেন, যাতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

তাৎপর্য

বেদ একটিই, এবং এখানে তার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। সমস্ত জ্ঞানের বীজ বা বেদ, সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য নয়। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারোর বেদ পাঠ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বিভিন্নভাবে এই নির্দেশটির ভুল অর্থ করা হয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ যারা কেবল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে জাহির করতে চায়, তারা দাবি করে যে, বেদ কেবল জাত-ব্রাহ্মণদেরই সম্পত্তি। আরেক শ্রেণীর লোক এই নির্দেশটিকে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহন করেনি যে সমস্ত মানুষ, তাদের প্রতি অন্যায় অবিচার বলে মনে করে। কিন্তু তারা উভয়েই ভ্রান্ত। বেদ হচ্ছে এমনই একটি বিষয়, যা ব্রহ্মাকে পর্যন্ত ভগবানের কাছ থেকে বুঝতে হয়েছিল; তাই এই জ্ঞান তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা কখনই বেদের তত্ত্ব বুঝতে পারে না। বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। রজ এবং তমোগুনের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা কখনই বেদের তত্ত্ব বুঝতে পারে না। বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। রজ এবং তমোগুনের দ্বারা প্রভাবিত মানুষেরা সাধারণত তাঁকে জানতে পারে না। সত্য যুগে সকলেই সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ছিল। ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে সত্ত্বগুণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং সাধারণ মানুষ কলুষিত হয়ে পড়ে। বর্তমান কলিযুগে সত্ত্বগুণ প্রায়

নেই বললেই চলে, তাই সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত কৃপাময় মহর্ষি বেদব্যাস বেদকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন যাতে রজ এবং তমোগুনের দ্বারা প্রভাবিত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা অনুসরণ করতে পারে। পরবর্তী শ্লোকে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৫

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥ ২৫॥

স্ত্রী-স্ত্রী জাতি; **শূদ্র**-শ্রমিক শ্রেণী; **দ্বিজ-বন্ধূনাম্**-দ্বিজোচিত গুণাবলীবিহীন দ্বিজকুলোদ্ভূত মানুষদের; **ত্রয়ী**-তিন; ন-না; **শ্রুতি-গোচরা**-বোধগম্য; **কর্ম**-কার্যকলাপে; **শ্রেয়সি**-কল্যাণ সাধনে; **মূঢ়ানাম্**-মূর্খদের; **শ্রেয়ঃ**-পরম কল্যাণ; **এবম্**-এইভাবে; **ভবেৎ-প্রাপ্ত হয়; ইহ**-এটির দ্বারা; **ইতি**-এইভাবে বিবেচনা করে; **ভারতম্**-মহাভারত; **আখ্যানম্**-ঐতিহাসিক তথ্য; **কৃপয়াঃ**-কৃপাপূর্বক; **মুনিনা**-মুনির দ্বারা; **কৃতম্**-রচিত হয়েছিল।

অনুবাদ

স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজোচিত গুণাবলীবিহীন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মানুষদের বেদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই, তাই তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করলেন, যাতে তারা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারে।

তাৎপর্য

যে সমস্ত মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, অথচ যাদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের সদ্‌গুণগুলি প্রকাশিত হয়নি, তাদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু। যথাযথ সংস্কার না থাকায় তাদের দ্বিজ বলে স্বীকার করা হয় না। বৈদিক সমাজে সংস্কারগুলি জন্মের পূর্ব থেকেই অনুষ্ঠান হয়। মাতৃগর্ভে বীজ রোপন করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় গর্ভাধান সংস্কার। এই গর্ভাধান সংস্কার বা পারমার্থিক পরিবার-পরিকল্পনা ব্যতীত যার জন্ম হয়েছে, তাকে যথার্থ দ্বিজ-পরিবারভুক্ত বলে গণনা করা হত না। গর্ভাধান সংস্কারের পর অন্য আরও সংস্কার রয়েছে যার একটি হচ্ছে উপনয়ন সংস্কার। এটি অনুষ্ঠিত হয় দীক্ষা গ্রহণের সময়। এই বিশেষ সংস্কারটির পর তাকে 'দ্বিজ' বলা হয়। প্রথম জন্ম হয় গর্ভাধান সংস্কারের সময়, এবং দ্বিতীয় বার জন্মটি হয় সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণের সময়। যাঁরা এই মহান সংস্কারগুলির দ্বারা যথাযথভাবে সংস্কৃত হয়েছেন, তাঁদেরই প্রকৃতপক্ষে দ্বিজ বলা হয়।

পিতামাতা যদি গর্ভাধান সংস্কাররূপ পারমার্থিক পরিবার-পরিকল্পনা না করে কেবল কামার্ত হয়ে সন্তান উৎপাদন করে, তা হলে তাদের সন্তানদের বলা হয় দ্বিজবন্ধু। এই দ্বিজবন্ধুরা যথাযথ সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত দ্বিজ পরিবারের সন্তানদের মতো ততটা বুদ্ধিমান হয় না। দ্বিজবন্ধুদের সাধারণত বুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রী এবং শূদ্রদের সমকক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়। শূদ্র এবং স্ত্রীদের বিবাহ সংস্কার ব্যতীত অন্য কোনও সংস্কার অনুষ্ঠান করতে হয় না।

অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা, অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই। তাদের জন্য মহাভারত রচনা করা হয়েছিল। মহাভারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাই এই মহাভারতে বেদের সারস্বরূপ ভগবদগীতা গ্রথিত হয়েছে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা দর্শনের থেকে গল্প শুনতে বেশি ভালবাসে, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতারূপে বৈদিক দর্শন দান করে গেছেন। ব্যাসদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই পারমার্থিক স্তরে রয়েছেন, এবং তাই এই যুগের অধঃপতিত জীবদের কল্যাণ সাধনের জন্য উভয়েই সচেষ্ট হয়েছেন। ভগবদগীতা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। এটি হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদ। পারমার্থিক স্তরে যাঁরা স্নাতক তাঁদের জন্য বেদান্ত দর্শন। পারমার্থিক দিক দিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে রয়েছেন, তাঁরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার জগতে প্রবেশ করতে পারেন। এটি একটি মহান বিজ্ঞান, এবং তার মহান্ আচার্য হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। আর যাঁরা তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় অন্যদের দীক্ষিত করতে পারেন।

শ্লোক ২৬

এবং প্রবৃত্তস্য সদা ভূতানাং শ্রেয়সি দ্বিজাঃ।
সর্বাত্মকেনাপি যদা নাতুষ্যদ্‌ধৃদয়ং ততঃ॥২৬॥

এবম্-এইভাবে; **প্রবৃত্তস্য**-যুক্ত; **সদা**-নিরন্তর; **ভূতানাম্**-জীবদের; **শ্রেয়সি**- পরম মঙ্গল সাধনের; **দ্বিজাঃ**-হে দ্বিজগণ; **সর্বাত্মকেন অপি**-সর্বতোভাবে; **যদা**-যখন; **ন**-না; **অতুষ্যৎ**-সন্তুষ্ট হওয়া; **হৃদয়ম্**-চিত্ত; **ততঃ**-তখন।

অনুবাদ

হে দ্বিজগণ, যদিও তিনি সমস্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তবুও তাঁর চিত্ত সন্তুষ্ট ছিল না।

তাৎপর্য

যদিও তিনি জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য তাদের উপযোগী করে বৈদিক শাস্ত্র সংকলন করেছিলেন, তবুও শ্রীল ব্যাসদেব চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, এত কিছু করার পর তিনি নিশ্চয়ই অন্তরে প্রসন্নতা অনুভব করবেন, কিন্তু চরমে তিনি প্রসন্ন হতে পারেননি।

– চলবে

পঞ্চরাত্র প্রদীপ

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তথা ষড়গোস্বামীগণের অর্চনা পদ্ধতির ভিত্তিতে
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক বিশ্বব্যাপী প্রবর্তিত
ইস্কন জিবিসি বিগ্রহ অর্চনা গবেষণা গোষ্ঠী সংকলিত

(আরতি উৎসব)

প্রত্যেকটি নির্ধারিত ভোগ নিবেদনের পরেই চলে আসে আরতি অনুষ্ঠান। প্রকাশ্যে শ্রীবিগ্রহ আরাধনার নিয়মসেবায় দৈনন্দিন অনুষ্ঠান বলতে কীর্তন ছাড়া অন্যটি হল এই আরতি নিবেদন।

প্রয়োজনীয় পরিকরাদি

সকল আরতির জন্য ঃ

১। থালায় একটি ঘন্টা

২। সামান্য-অর্ঘ্যজল (কিংবা শুধুই বিশুদ্ধ জল) পূর্ণ পঞ্চপাত্র এবং একটি কুষি (চামচ)

৩। শঙ্খ (বাজানোর জন্য) এবং সেটি শোধনের জন্য ঘটিভর্তি জল,

৪। শঙ্খ শোধনের জল রাখার পাত্র (মন্দির কক্ষে শ্রীবিগ্রহকক্ষের ঠিক বাইরে)।

তা ছাড়া, পূর্ণাঙ্গ আরতির জন্য ঃ-

১। ধূপদানি এবং বিজোড় সংখ্যক ধূপকাঠি,

২। কর্পূরদীপদানি (মধ্যাহ্ন আরতির জন্য),

৩। ঘৃতদীপদানি এবং বিজোড় সংখ্যক সলতে (অন্তত পাঁচটি),

৪। অর্ঘ্যজলের জন্য শঙ্খ ও শঙ্খদানি,

৫। জলপূর্ণ কমণ্ডলু (শঙ্খের মধ্যে অর্ঘ্যজল নিবেদনের জন্য),

৬। নিবেদিত অর্ঘ্যজলের জন্য ছোট বিসর্জনীয় পাত্র,

৭। রুমাল,

৮। থালাভর্তি ফুল,

৯। চামর,

১০। ময়ূরপঙ্খী পাখা (কেবল গ্রীষ্মকালে।

ধূপ-আরতির জন্য ঃ-

১। বিজোড় সংখ্যক ধূপকাঠি সমেত ধূপদানি,

২। থালাভর্তি ফুল,

৩। চামর,

৪। ময়ূরপঙ্খী পাখা (কেবল গ্রীষ্মকালে)।

আরতির-প্রারম্ভিক কার্যাবলী

শ্রীবিগ্রহ-কক্ষের বাইরে, আচমন সম্পন্ন করে নিয়ে (তা যদি পূর্বের সেবা নিবেদনের সময়ে না করা হয়ে থাকে), আরাধনা নিবেদনে শ্রীগুরুদেবের ব্রতসাধনে সহযোগিতার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করে তাঁর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করতে হয়।

সামান্য অর্ঘ্য জল এনে রাখতে হবে, কিংবা সরলভাবে আরাধনা করার ক্ষেত্রে, বিশুদ্ধ জল ও কুষি সমেত পঞ্চপাত্র থাকা চাই।

যেখানে আরতির পরিকরাদি রাখা হবে (ছোট নিচু টেবিল-টুল, কিংবা মেঝে, অথবা স্থান সঙ্কুলান হলে, বেদির ওপরেই) পরিষ্কার করে নিতে হবে, পরিকরাদি সমেত থালাটি এনে আরতির ক্রম অনুসারে সেইগুলি সাজিয়ে রাখতে হবে।

এবার একটি দীপদানি কিংবা ঝুলন্ত তৈলপ্রদীপ বা ঘৃতপ্রদীপ জ্বেলে নিতে পারা যায়, যা থেকে ধূপ এবং আরতি দীপগুলি জ্বালাতে হবে।

আরতি নিবেদন গ্রহণের জন্য শ্রীভগবানের প্রতি মিনতি (পুষ্পাঞ্জলি)

ঘন্টা বাজাতে বাজাতে, শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে এবং পরে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের পাদপদ্মে পুষ্পরাজি নিবেদন করে, আরতি উৎসবের নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে মিনতি জানাতে হয়। পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের ক্রমানুসার হয় এইভাবে ঃ শ্রীগুরুদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীমতী সুভদ্রা, শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীমতী রাধারাণী, এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। পুষ্পরাজি নিবেদনের সময়ে, এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ মন্ত্র এবং প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করতে হয়। কিংবা সরল আরাধনার ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র বলতে হয়, "কৃপা করে এই সমর্পিত পুষ্পরাজি গ্রহণ করুন।" (প্রয়োজন হলে, পুষ্পরাজির পরিবর্তে এক-এক কুষি জল পঞ্চপাত্র থেকে নিয়ে এক-একজন শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে ধারণ করে সেটি বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলে দিতে হয়, কিংবা শুধুই মানসভাবে তাঁদের উদ্দেশ্যে পুষ্পকোরক নিবেদন করতে হয়।

আবার ঘন্টা বাজিয়ে, শ্রীবিগ্রহকক্ষের দরজাগুলি খুলে দিতে হয়। তারপরে, ধ্বনিশঙ্খটি ও জলের ঘটি তুলে নিয়ে শ্রীবিগ্রহকক্ষের বাইরে গিয়ে (ঘন্টা ছাড়া), তিনবার শঙ্খধ্বনি করে, বাইরে-রাখা একটি পাত্রের ওপর সেটি জলে ধুয়ে নিয়ে আবার শঙ্খ ও ঘটি ভেতরে এনে রাখতে হয়। (ঘটির ওপরে শঙ্খটিকে আড়ভাবে রাখা চলে।) এরপরে পঞ্চপাত্র থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে পর্দা খুলে দিতে হয়।

আরতি উৎসব অনুষ্ঠানের সময়ে, ভক্তরা মন্দিরে কীর্তন করতে থাকবেন। দুর্ভাগ্যবশত কীর্তনের জন্য কেউ যদি মন্দিরে না থাকেন, তবে আরতি করতে করতে পূজারী কীর্তন গাইতে বা বাণীবদ্ধ কীর্তন বাজাতেও পারেন।

উপচারাদি পরিশোধন

প্রত্যেকটি উপচার নিবেদনের আগে, পঞ্চপাত্র থেকে জল নিয়ে পূজারীর নিজ ডানা হাতে এবং উপচারে তা সিঞ্চন

করে পরিশোধন করে নিতে হয়। দুটি পদ্ধতির যে কোনও একটি পালন করে উপচার পরিশোধন করা চলে ঃ (১) কয়েক ফোঁটা জল নিজের ডানহাতে রেখে তা মৃদুভাবে হাত দিয়ে উপচারের ওপরে সিঞ্চন করে দিতে হয়, যাতে ঐ জল আঙুলের ডগা দিয়ে নেমে আসে, কিংবা (২) ডানহাতে জলের কুষিটা নিয়ে তা থেকে সরাসরি উপচারের উপরে জল সিঞ্চন করতে হয়। এছাড়া, ইচ্ছা হলে, ঐ দুটি পদ্ধতির সঙ্গে চক্রমুদ্রা, ধেনুমুদ্রা (কিংবা সুরভিমুদ্রা), এবং মৎস্যমুদ্রাগুলি প্রত্যেকটি উপকরণের উপরে প্রদর্শন করা চলে, যাতে আরও সুক্ষ্ম পরিশোধন এবং সুরক্ষা সুনিশ্চিত হতে পারে।

নিবেদনের পদ্ধতি

আসনের উপরে দাঁড়িয়ে এবং ঘন্টা বাজাতে বাজাতে, ধুপকাঠি প্রথমে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে তিন অথবা সাতবার মনোরম ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দেখিয়ে, এবং তারপরে তা একইভাবে শ্রীল প্রভুপাদকে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখাতে হয়।

আরতি উপকরণাদি মনোরমভাবে নিমগ্নচিত্তে নিবেদন করা কর্তব্য। কিন্তু খুব দ্রুত অথবা খুব ধীরে ধীরে নিবেদন করা ভাল নয় এবং নিবেদনের ভঙ্গিমা যেন খুব লোক দেখানো না হয়, তবে তা অবশ্যই শ্রীগুরুদেব এবং সমবেত বৈষ্ণবজনমণ্ডলীর বিনীত সেবকরূপে প্রদর্শিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বেদির বামদিকে দাঁড়াতে হয় (মন্দিরকক্ষ থেকে যেমন দেখায়)- লোকচক্ষুর অন্তরালে নয়, অথচ শ্রীবিগ্রহাদির দর্শনপথের বিঘ্ন যেন না ঘটে।

শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ শিষ্য নন যে সমস্ত ভক্ত, তাঁরা-নিজ নিজ গুরুদেবের আরাধনার সাথে, ইসকনে অবস্থানকারী সমস্ত ভক্তগণের সঙ্গে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকেও ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যরূপে এবং ইসকনের সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর শিক্ষাগুরুরূপে আরাধনা করে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের গুরু-পূজা অনুষ্ঠানের সময়ে তাঁর বন্দনা করা সত্ত্বেও, আরতির সময়েও আরতির উপকরণাদি নিজ গুরুদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদনের পরে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যেও তাঁর সম্মানার্থে নিবেদন করতে হয়।

তারপরে, সব কিছুই নিজ গুরুদেবের পক্ষে এবং শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদসহ নিবেদিত হচ্ছে, সেই বিষয়ে সচেতন হয়ে প্রধান বিগ্রহের উদ্দেশ্যে তা নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী পরিপূর্ণ সংখ্যক ক্রম অনুসারে নিবেদন করতে হয়।

প্রধান বিগ্রহের উদ্দেশ্যে ধূপ নিবেদনের পরে, সেটি প্রসাদরূপে নিম্নক্রমানুসারে (অবরোহ ক্রমে) শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গের এবং গুরু পরম্পরার সকলকে-প্রবীণতম থেকে কনিষ্ঠতম সকলকে-নিবেদন করতে হয়। সময়-সুযোগ অনুপাতে, প্রত্যেকজনের উদ্দেশ্যে সাত কিংবা তিনবার চক্রাকারে নিবেদন করা যেতে পারে।

(কোনও কোনও পদ্ধতি-পুস্তকে বলা হয়েছে যে, আরতির সময়ে প্রসাদরূপে কিছু নিবেদনের সময়ে, কটিদেশের নিম্নভাগে নিবেদন করা অনুচিত।)

তারপরে সেটি (একবার বা তিনবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে) সমবেত বৈষ্ণবজনের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান এবং তাঁর পার্ষদবর্গের প্রসাদরূপে নিবেদন করা উচিত।

অবশিষ্ট উপকরণগুলিও একইভাবেই নিবেদন করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি উপচার নিবেদনের সময়ে মৃদু স্বরে উপচারটির নামোল্লেখ করতে হয় এবং যে বিগ্রহের অর্চনা করা হচ্ছে, তাঁর উদ্দেশ্যে যথাযথ মূলমন্ত্রটি উচ্চারণ করা উচিত। কিংবা সহজ সরল অর্চনা পদ্ধতি অনুসারে, শুধুমাত্র প্রত্যেক বিগ্রহের উদ্দেশ্যে বলা চাই, "কৃপা করে এই [ধূপ, দীপ, ইত্যাদি] নিবেদন গ্রহণ করুন।"

নিবেদিত উপকরণগুলির সাথে অনিবেদিত উপকরণগুলি একসাথে মিশে যেন না যায়। পরিকরাদি আনবার সময়ে যে থালাটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তাতেই উপকরণগুলি আবার তুলে রাখা যেতে পারে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নিবেদন করা হয়নি, এমন উপকরণগুলি ঐসঙ্গে মিশে না যায়।

প্রত্যেকটি উপকরণ কিভাবে নিবেদন করতে হয়

চামর ও পাখা ছাড়া, সব উপকরণগুলিই বাম দিকে থেকে ডান দিকে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরিয়ে দেখাবার সময়ে বাম হাতে (কোমরের ওপরে) ঘন্টা বাজাতে হয় এবং শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়।

ধুপ ঃ শ্রীভগবানের সমগ্র দিব্য শরীরের চারিপাশে সাতবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে নিবেদন করতে হয়।

দীপ ঃ ভগবানের পাদপদ্মে চারবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে দেখাতে হয়, নাভিদেশের উদ্দেশ্যে দু'পাক, এবং শ্রীভগবানের মুখমণ্ডলে এলে তিন পাক ঘোরাতে হয়, তারপরে তাঁর সর্বাঙ্গে সাত পাক দীপ দেখাতে হয়।

শঙ্খ নিয়ে অর্ঘ্য ঃ শ্রীভগবানের শিরোদেশে তিন পাক নিবেদন এবং তাঁর সমগ্র দিব্যদেহে সাত পাক নিবেদন করতে হয়। তারপরে সামান্য পরিমাণে অর্ঘ্য জল বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলে দিতে হয় এবং পরবর্তী শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদনে অগ্রসর হতে হয়।

(আরতি অর্ঘ্য ঃ বিশুদ্ধ বা সুগন্ধি জল)

বস্ত্র ঃ শ্রীভগবানের শরীরের চারিধারে সাতপাক, ঘোরাতে হয়।

পুষ্পাদি ঃ শ্রীভগবানের শরীরের চারিধারে সাতপাক ঘোরাতে হয়।

চামর ঃ শ্রীভগবানের সামনে যথোপযুক্তভাবে কয়েকবার দোলাতে হয়।

পাখা ঃ শ্রীভগবানের সামনে যথোপযুক্তভাবে কয়েকবার দোলাতে হয়।

শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে দীপগুলি নিবেদিত হয়ে যাওয়া মাত্রই সেইগুলি সমবেত ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে এগিয়ে দিতে

(১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভের উপায়

এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে কিভাবে আপনি গৃহে থেকে আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভ করতে পারেন

-প্রেমাঞ্জন দাস

মাঝে মাঝে পৃথক বসবাস

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন কেন্দ্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রীল প্রভুপাদের নানাবিধ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাপক তথা তত্ত্বাবধায়ক বা ম্যানেজারের দায়িত্বপদে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই গৃহস্থ ভক্ত-একথা শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং স্বীকার করেছেন। এর কারণ হিসাবেও তিনি জানিয়েছেন যে, গৃহস্থ ভক্তদের মধ্যে একাধারে নানা সমস্যার মোকাবিলা করবার মতো স্বাভাবিক প্রবণতা গড়ে ওঠে।

এই কারণেই ইসকনে ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কেউ গার্হস্থ আশ্রমে প্রবেশের আগ্রহ প্রকাশ করলে, শ্রীল প্রভুপাদ কতকগুলি কঠোর সর্তসাপেক্ষে সানন্দেই অনুমতি দিতেন। অনুমতি দেওয়ার হেতু এই যে, গৃহস্থ ভক্ত তাঁর বিবাহিতা পত্নীর সহায়তায় কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার কার্যে দ্বিগুন শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হন এবং পতি-পত্নীর মিলিত উদ্যোগে এবং নিষ্ঠায় পরমেশ্বর ভগবানের সেবাকার্য অনেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

তবে একটা বিষয়ে প্রত্যেক গৃহস্থ ভক্তকে শ্রীল প্রভুপাদ সতর্ক করে দিতেন যে, গার্হস্থ জীবনে স্ত্রীকে সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থা থেকে সুরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করতেই হবে, কারণ বিবাহ সূত্রের মূল সামাজিক তথা পারমার্থিক উপযোগিতা সেইটাই। পতির অন্যতম দায়িত্ব হল পত্নীকে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে উদ্বুদ্ধ করা এবং সেই কারণে বিবাহ জীবনে বিচ্ছেদের যে কোনও প্রকার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকা তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুদায়িত্ব বটে।

অবশ্য, অনেক সময়ে গৃহস্থ ভক্ত লক্ষ্য করেন যে, তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীর মানসিকতা ভাবাবেগ জর্জরিত এবং তার ফলে গৃহস্থের পক্ষে গার্হস্থ জীবনে নানা বিষয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তেমন ক্ষেত্রে গৃহস্থ ভক্তকে মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রীর পারমার্থিক উন্নতি বিকাশের দায়িত্ব তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই গ্রহণ করেছেন, সুতরাং অতিশয় গুরুত্ব সহকারে স্ত্রীকে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের পথে পরিচালিত করার জন্য তাঁকে সহায়তা করতেই হবে-সেটাই গৃহস্থ জীবনে তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য।

যদি অবশ্য অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও এবং গুরুতর প্রয়াসের পরেও স্ত্রীকে কৃষ্ণভাবনামুখী করে তুলতে না পারা যায়, তা হলে তাঁকে সর্ব প্রকারে সাহায্য সহযোগিতা করা হয়ত আর কার্যকরী না হতেও পারে এবং তখন তাঁকে নিয়ে পারমার্থিক উন্নতি বিকাশের আশা হয়ত সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করতেও হয়। ভক্তকে বিচার করতে হবে যে, তাঁর নিজের পারমার্থিক বিকাশের পথে স্ত্রীর আচরণ বিঘ্ন সৃষ্টি করছে কিনা–ভক্তিমার্গে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সকলের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা অবশ্যই বিধেয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গৃহস্থ ভক্ত অবশ্যই মনে রাখবেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে বিবাহ করে গৃহের গৃহিনী করেছেন এবং তাই কখনও বিবাহ বিচ্ছেদের কোনই প্রশ্ন ওঠে না। মাঝে মাঝে দু'জনে পৃথকভাবে বসবাস করে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসী হতে পারেন, কিন্তু সর্বপ্রকারে স্ত্রীকে তাঁর পারমার্থিক জীবনে শুদ্ধ হয়ে ওঠার জন্য সহায়তা করার ব্যাপারে গৃহস্থ ভক্তকে বিশেষভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বিচ্ছিন্নতাও শ্রীকৃষ্ণের কৃপাধন্য আনুকূল্য

বিবাহিতা স্ত্রীকে অবশ্যই সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে পতির প্রতি বিশ্বস্ত এবং নিষ্ঠাবতী হতে হবে। বৈদিক সভ্যতা, যা ভারতীয় সমাজের ভিত্তি স্বরূপ, তাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীকে অতি সাধ্বী হতে হয় এবং পতিকে প্রভুরূপে মান্য করতে হয়। বিশেষ করে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে উন্নত পতি-পত্নির মধ্যে ঠিক এমনই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে ওঠা অপরিহার্য।

পতি-পত্নীর মধ্যে যদিও কোন মতদ্বৈধতা কখনও কখনও প্রকাশ পায়, তবে তাতে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে আমল না দেওয়াই মঙ্গল এবং উভয়কেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবানিষ্ঠায় আরও বেশি আত্মমগ্ন হয়ে থাকতে হয়। বাস্তবিকই, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা অভিলাষ পতি-পত্নীর অন্তরে সমানভাবে স্থান পেলে কোনও মতানৈক্যই গুরুত্ব লাভ করতে পারে না।

তাই গৃহস্থ ভক্তের উচিত-কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনেই অধিকতর মনোনিবেশ করে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনোমালিন্যগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখা। দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক মাধুর্য অক্ষুন্ন রাখার অনুকূলে এই জীবনাদর্শ অতীব কার্যকরী নীতি, তা অনস্বীকার্য।

বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়েরা আদর্শ বৈষ্ণব গৃহস্থ হয়ে বিবাহিত জীবন যাপন করবে, সেটাই সমাজে বাঞ্ছনীয়। তবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাধন্য হয়ে ছেলে আর মেয়ে উভয়েই যদি পৃথকভাবে বসবাস করতে পারে, তবে তো আরও মঙ্গলজনক। কিন্তু তা হবার নয়। ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের প্রবণতা থেকে যদি মনঃসংযোগ শ্রীকৃষ্ণের সেবাভিমুখী করে তোলা যায়, তাহলে সারা জীবনব্যাপী এককভাবে ব্রহ্মচারীর শুদ্ধ সাত্ত্বিকতার আদর্শে অতিবাহিত করা সম্ভব। অবশ্য নানা কারণে অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের পক্ষে সেটা প্রায় দুঃসাধ্য এবং এক প্রকার সামাজিক অপূর্ণতাও বটে।

তা সত্ত্বেও দেখা গেছে, অনেক ছেলে এবং অনেক মেয়ে গার্হস্থ্য অধ্যায়ে প্রবেশ করতে পারেনি কিংবা প্রবেশ করবার পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। মনে করতে কোনই দ্বিধা নেই যে, সেই বিচ্ছিন্নতাও এক প্রকার পরম করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপাধন্য আনুকূল্য বটে। তখন বিচ্ছিন্ন জীবনে ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণীরা আরও অনেক ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদের জীবনাদর্শে পথপ্রদর্শন করতে অবশ্যই পারে। তারা সকলে একসঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে মনকে কৃষ্ণভাবনামৃতের মধুময় আস্বাদনে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারে বৈকী।

কৃত্রিম বিচ্ছিন্নতা কখনই অনুমোদনযোগ্য নয়। আর যখন দেখা যাবে, ছেলে আর মেয়েরা কৃষ্ণসেবায় মগ্ন হয়ে একসঙ্গে বসবাস করা সত্ত্বেও কোন প্রকারে ইন্দ্রিয় উপভোগের লালসায় বশবর্তী হচ্ছে না, তখন সুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, সেই জীবনাদর্শ শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মানব সভ্যতা সেই উত্তুঙ্গ জীবনাদর্শ লাভের জন্য যুগযুগান্তর ধরে চেষ্টা করে আসছে।

সেই স্বেচ্ছা-সংযম এক প্রকার তপস্যা, কৃচ্ছ্রতা, সংযত সামাজিকতা বটে। আর সেই সমুন্নত সংযমী জীবনাদর্শ আয়ত্তীকরণের একমাত্র পন্থা যে, কৃষ্ণ-ভাবনামৃত অনুশীলন। সেই বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

কৃত্রিমভাবে তিক্ততার মাধ্যমে গার্হস্থ্য বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই নির্বুদ্ধিতা। আমরা চাই স্বেচ্ছা প্রণোদিত বিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য। আর তা না হলে, পতি-পত্নীরূপে পূর্ণ সামাজিক পালন। কৃত্রিমভাবে গার্হস্থ্য জীবনাশ্রম বর্জন করাও অনভিপ্রেত; আমরা চাই কৃষ্ণভাবনামৃতের সঞ্জীবনীশক্তি সমন্বিত হয়ে গৃহস্থরা সমাজকে সুস্থ চিন্তা সমন্বিত করে তুলবে।

উপদেশে উপাখ্যান

থাকতে আলো এগিয়ে চলো

দুইজন পথিক চলছে তাদের বাড়ির উদ্দেশে। অনেক দূর পথ। গাড়ি ঘোড়া নেই। দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছাতে হবে। রাত হলে বাটপারদের উৎপাত এবং পাশাপাশি বনজঙ্গলের জানোয়ারদের আক্রমণের ভয় আছে।

প্রথম পথিক বলছে, লম্বা করে পা ফেলে হাঁটো। বেলা যে গড়িয়ে এলো। বন পেরোতে হবে।

দ্বিতীয় পথিক বলছে, একটু বসে বিশ্রাম নেই, তারপর দৌড়াব। পথপাশে লাঠি জোগাড় করে নেব। কোন জন্তু সামনে এলেই পেটাবো। অনেক দূর পথ তো হাঁটছি। তাই একটু বিশ্রাম করে নিলে ভাল হবে।

প্রথম পথিক বলে, তোমার পায়ে যদি ব্যথা থাকে গামছা ছিঁড়ে পায়ে বাঁধুনী দিয়ে হাঁটো। বসে থাকার সময় নেই। বাঘ-সিংহ যখন লাফিয়ে তেড়ে আসবে, তখন হাতে লাঠি থাকলেও বিপদ সামলানো দায় হবে। মোড়ে মোড়ে বাটপারদের দলে যদি পড়ো, তবে আর লাঠির কেরামতি থাকবেনা। তাই দিনের আলো থাকতে থাকতে এগিয়ে চলো। বসে থাকলে পথ ফুরাবে না। হাঁটতে থাকো তবে যথাসময়ে বাড়ি পৌঁছাবে।

তারা হাঁটতে লাগল। অমনি বেশ কিছু দূর গেলে পেছন দিক থেকে কয়েক জন দস্যু তাদের হাঁক-ডাক দিয়ে জানাচ্ছিল, 'খাড়া হো, খাড়া হো'। দস্যুরা ধাওয়া করছে দেখে দুই পথিক দৌড়াতে লাগল। দস্যুদের নাগালের বাইরে তারা এসেছিল। দ্বিতীয় পথিক বুঝতে পারল, যদি বসে বিশ্রাম নিতাম, তবে তো দস্যুর হাতেই মরতাম। তারপর যথাসময়ে তারা বাড়ি পৌঁছেছিল।

হিতোপদেশ

মানুষ জীবনের প্রথম থেকে যদি হরিভজনের পথে না এগোতে থাকে, তবে বয়স ফুরাতে থাকে। আর হরিভজন করা সম্ভব হয় না। আয়ুষ্কাল এবং সুস্থ শরীর থাকতে থাকতে হরিভজন অনুশীলন করতে হয়। অনুশীলন করতে করতে যথাসময়ে হরিধামে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। বিষয়-আশয় ভোগ করা যাক, ভজন-সাধন পরে হবে। এরকম দুর্বুদ্ধি থাকলে, সেই ভোগই দুর্ভোগের কারণ হয়।

ধৈর্যের পরীক্ষা

এক কচ্ছপের সঙ্গে দু'টি হাঁসের বন্ধুত্ব হল। তারা এক সরোবরে বাস করত। একদিন জেলেরা সরোবরে সমস্ত মাছ ও কচ্ছপ ধরার জন্য লেগে পড়ল। তখন কচ্ছপটি দুশ্চিন্তায় পড়ল। সে হাঁসদের সঙ্গে পরামর্শ করল। 'কি হবে উপায়?'

হাঁসেরা বলল, 'একটি কাঠির মাঝখানে তুমি কামড়ে থাকো। আর আমরা কাঠির দুই প্রান্ত ধরে উড়তে থাকবো। এভাবে দূরের অন্য কোনও সরোবরে চলে যেতে পারব।'

কচ্ছপ বলল, 'হ্যাঁ শীঘ্রই সেই উপায় কর।' হাঁসেরা বলল, 'একটি শর্ত মেনে চলবে, নইলে বিপদ আছে। শর্তটি হল, অন্য সরোবরে না পৌঁছানো পর্যন্ত মুখ খুলবে না।'

এভাবে হাঁসেরা কচ্ছপকে নিয়ে উড়তে লাগল। তারা অন্য সরোবরের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের দেখতে পেল মাঠের রাখালেরা। এক আমিষাশী রাখাল বলতে লাগল, 'আঃ কচ্ছপটা মাটিতে পড়লেই পুড়িয়ে খাব।'

সেই কথা কচ্ছপ শুনতে পেল। সে অত্যন্ত ক্রোধে জ্বলে উঠল। সে রাখালদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল 'ছাই খা'। যেই বলল, অমনি মুখ খুলে মাটিতে ধপ্ করে পড়ল। রাখালেরা কচ্ছপকে মেরে ফেলল। হাঁস দুটি দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'যার ধৈর্য নেই, সহ্য করার ক্ষমতা নেই, কথায় কথায় যে বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে ওঠে, তারই দুর্গতি হয়।'

হিতোপদেশ

সাধন ভজনের ক্ষেত্রে সমস্ত দৈব দুর্বিপাকগুলিকে নীরবে সহ্য করে চলা উচিত। রক্ষাকর্তা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার মাধ্যমে মানুষ দুর্গতি থেকে উদ্ধার পায়। কিন্তু স্মরণ না হলে বিপদ আছে। জড়জাগতিক প্রভাব মনকে বিচলিত করবে। এটিই জড় জাগতিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কৃষ্ণস্মরণ না হলে দুঃখময় সংসার অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

চিঠিপত্র

প্রশ্ন (১) ঃ ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র "অমৃতের সন্ধানে"-এর তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় 'এ যুগের সমস্যাদির পারমার্থিক পর্যালোচনা' কলামে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে 'জগদ্‌গুরু' বলেছেন। এই উক্তিটির কোন শাস্ত্রীয় প্রমানাদি আছে কি ? থাকলে শাস্ত্রীয় প্রমানাদিসহ জানালে উপকৃত হব।

প্রশ্নকর্তা ঃ মাষ্টার যতীন্দ্র মোহান গোস্বামী
গীতা সংঘ, রামমোহন বাজার, চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ কলিযুগের যুগধর্ম 'হরিনাম সংকীর্তন' এর প্রবর্তক মহাবদান্য অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বানী করেন, "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" সে প্রায় পাঁচশ বছর আগের কথা তখন সাধারণ মানুষ জানতই না, পৃথিবীটা কত বড়, তাতে কত সমস্ত নগর ও গ্রাম রয়েছে। পাঁচশ বছর কেন আজ থেকে পয়ত্রিশ বছর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী পৃথিবীর সমস্ত নগরে ও গ্রামে-প্রচারের কথা সাধারণ মানুষ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারত না। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই তাঁর ভবিষ্যদ্বানী কখনও ব্যর্থ হবার নয়। যিনি সর্বশক্তিমান এবং সারা জগতের অধীশ্বর। তাঁর পক্ষে তো কোন কিছুই অসম্ভব নয়, পক্ষান্তরে তারই ইচ্ছায় সবকিছু সম্পাদিত হয়। তাই তিনি যখন চেয়েছেন, সারা পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে কৃষ্ণভক্তির প্রচার হোক, তখন তা হবেই। তবে সেই কাজটি তিনি নিজে সম্পন্ন করতে চাননি। তা করার জন্য তিনি পাঠিয়েছেন তাঁর এক অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদকে, এবং সেই মহান ব্যক্তিটি হচ্ছেন–জগদ্‌গুরু শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। এখানে জগদ্‌গুরু সম্মোধনের যুক্তি সুস্পষ্ট। যিনি এই যুগের যুগধর্ম 'হরিনাম সংকীর্তনের' প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বানী সার্থক করে সারা পৃথিবীকে হরিনামের বন্যায় প্লাবিত করেছেন, তিনিই হচ্ছেন এই যুগের প্রকৃত আচার্য। তাঁর অবদান পূর্বতন আচার্যদের অবদান থেকে স্বতন্ত্র নয়। পক্ষান্তরে, তা তাঁদের অবদানের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। পূর্বপুরুষেরা যেমন কোন বিশেষ বংশধরের মহিমা কীর্তিত হলে প্রসন্নই হন, তেমনই এই যুগের সমস্ত আচার্যেরা শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদানের জন্য তাঁকে জগদ্‌গুরু বা যুগাচার্য উপাধিতে ভূষিত করা হলে অবশ্যই অপ্রসন্ন হবেন না। সর্বপোরি শ্রীল প্রভুপাদকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেই যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

প্রশ্ন (২) ঃ ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'অমৃতের সন্ধানে' তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় চিঠিপত্র কলামে ৫নং প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন- আমরা যে কৃষ্ণসেবা করছি- তা কৃষ্ণ গ্রহন করছেন কিনা তা বুঝা যাবে শ্রীগুরুদেব আমার সেবায় প্রসন্ন আছেন কিনা। যদি গুরুদেব প্রসন্ন থাকেন' তবে শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে সেই সেবা গ্রহন করেছেন। এটা কোন্ শাস্ত্রে কিভাবে আছে প্রমানাদি সহ উত্তর দিলে অন্ধকারে আলো জ্বলে উঠবে। তবে আরও জানার বাসনা যে, শ্রীগুরুদেব বলতে কি বুঝানো হচ্ছে ? শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য কি ? শাস্ত্রীয় মানদন্ডে প্রমানসহ উত্তর দিবেন।

প্রশ্নকর্তা ঃ পূর্বের।

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভবদগীতায় (৪/৩৪) বলেছেন'

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

"সদগুরুর শরনাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্তিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তাহলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে উপদেশ দান করবেন।"

মুন্ডক উপনিষদে (১/২/১২) বলা হয়েছে-

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠম॥

"পরমার্থ বিষয়ক বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করতে হলে, আমাদের গুরু পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত সদগুরুর শরণাগত হতে হবে, যিনি ব্রহ্মানিষ্ঠ।" যথার্থ গুরু হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি, পূর্বতন আচার্যদের প্রতিনিধি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমস্ত আচার্যরা হচ্ছেন তাঁর প্রতিনিধি ; তাই গুরুদেবকে ভগবানেরই মতো সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। যে কথা গুরু পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর রচিত গুর্বাষ্টকের ৮ম শ্লোকে বলেছেন, "যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদঃ অর্থাৎ গুরুদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায়।" গুরুদেবের কাছে আমরা যেভাবে আত্মসমর্পন করি, সেই অনুসারে ভগবান আমাদের গ্রহন করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির কাছে প্রথমে আত্মসমর্পন করতে হয়, তারপর শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পন হয়। সেটিই হচ্ছে পন্থা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গুর্বাষ্টকের ৭ম শ্লোকে বলেছেন–

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরো শ্রীচরণার বিন্দম্॥

"নিখিল শাস্ত্র যাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহরূপে কীর্তন করেছেন এবং সাধুগনও যাকে সেইরূপ চিন্তা করে থাকেন। কিন্তু যিনি ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই ভগবানের অচিন্ত-ভেদাভেদ প্রকাশ বিগ্রহ-শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।"

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়। তবে তার আলাপেহ পুণ্য যায় ক্ষয়॥

যেহেতু গুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় সেবক, তাই তাঁকে ভগবানেরই মতো সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ভগবান, গুরুদেব সর্ব অবস্থাতেই গুরুদেব ! ভগবান হচ্ছেন আরাধ্য ভগবান, আর গুরুদেব হচ্ছেন সেবক ভগবান। এটাই শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য।

প্রশ্ন (৩) ঃ ছয় রকমের অবতার আছে (১) লীলাবতার (২) যুগাবতার (৩) পুরুষাবতার (৪) গুনাবতার (৫) শক্ত্যাবেশ অবতার (৬) মন্বন্তর অবতার, কৃপা করে এই ছয় প্রকার অবতার সম্পর্কে বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন্ কোন্ অবতার ?

প্রশ্নকর্তা ঃ সুমন চন্দ্র বসাক ছোট ঝিন্যাঘৈর (বসাক পাড়া) সাকরাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর ঃ পরব্যোমে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অংশপ্রকাশ যাঁরা এই প্রপঞ্চে অবতরণ করেন তাদের 'অবতার' বলে। শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ বা শ্রীবিষ্ণুর অবতারের সংখ্যা অনন্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৬) উল্লেখ আছে যে, মহাসমুদ্রের অন্তহীন উর্মিমালার মত ভগবানের অবতারও সংখ্যাতীত, অনন্ত। অবতার ছয় রকম, (১) পুরুষাবতার (২) লীলাবতার (৩) গুনাবতার (৪) মন্বন্তরাবতার (৫) যুগাবতার (৬) শক্ত্যাবেশাবতার। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।

১। পুরুষাবতার ঃ ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি।

তিন পুরুষাবতার-মহাবিষ্ণু (কারণোদকশায়ী বিষ্ণু), গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু।

২। লীলাবতার ঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩) নিম্নলিখিত লীলাবতারের নাম উল্লেখিত আছে ঃ কুমার, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নর-নারায়ন, কার্দামি কপিল, দত্তাত্রেয়, হয়শীর্ষ, হংস, ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কুমার, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, ভার্গব (পরশুরাম), রাঘবেন্দ্র, ব্যাস, প্রলম্বারি বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি। এই ২৫ জন লীলাবতারের প্রায় সকলেই ব্রহ্মার একদিনে বা কল্পে আবির্ভূত হওয়ায় তাদের কল্পাবতারও বলা হয়। এদের মধ্যে হংস ও মোহিনী নিত্য মূর্তি নয়, কিন্তু কপিল, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধন্বন্তরি ও ব্যাস এই পাঁচজন নিত্য মূর্তি খুবই প্রসিদ্ধ। কূর্ম, মৎস, নর-নারায়ন, বরাহ, হয়শীর্ষ, পৃশ্নিগর্ভ ও বলরাম ভগবানের বৈভব রূপের অবতার। প্রসংগতঃ বিভিন্ন গ্রন্থ বা পঞ্জিকায় উপরোক্ত লীলাবতারদের মধ্যে, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি এই দশজন দশাবতার নামে বিশেষভাবে উল্লেখিত। বস্তুতঃ লীলাবতারের সংখ্যা অনন্ত।

৩। গুনাবতার ঃ

বিষ্ণু - সত্ত্বগুনাধীশ, ব্রহ্মা- রজোগুনাধীশ, শিব- তমোগুনাধীশ

৪। মন্বন্তরাবতার ঃ

অবতারের নামঃ যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্বভৌম, ঋষভ, বিশ্বক্সেন, ধর্মসেতু, সুদামা, যজ্ঞেশ্বর, বৃহদ্ভানু।

মন্বন্তরের নাম ঃ

স্বায়ম্ভোবো, সারোচিষ, উত্তমৌজা, তমসো, বৈরতো, চাক্ষুষো, বৈবস্বত (বর্তমান মন্বন্তর), সাবর্ন্য, দক্ষ সাবর্ন্য, ব্রহ্ম সাবর্ন্য, ধর্ম সাবর্ন্য, রুদ্র সাবর্ন্য, দেব সাবর্ন্য, ইন্দ্র সাবর্ন্য।

মনুর নাম ঃ

১। সায়ম্ভুব (ব্রহ্মার পুত্র) ২। স্বারোচিষ (অগ্নিপুত্র)
৩। উত্তম (প্রিয়ব্রতের পুত্র) ৪। তামস (উত্তমের ভ্রাতা)
৫। রৈবত (তামসের ভ্রাতা) ৬। চাক্ষুষ (তামসের ভ্রাতা)
৭। বৈবস্বত (সূর্যদেবের পুত্র) ৮। সাবর্নি (সূর্যদেবও তাঁর একপত্নী ছায়ার পুত্র) ৯। দক্ষসাবর্নি (বরুনের পুত্র)
১০। ব্রহ্ম সাবর্নি (উপশ্লোকের পুত্র) ১১। ধর্ম সাবর্নি
১২। রুদ্র সাবর্নি ১৩। দেব সাবর্নি ১৪। ইন্দ্র সাবর্নি

ব্রহ্মার একদিন বা কল্পে (বর্তমান কল্পের নাম শ্বেত বরাহ কল্প) উপরোক্ত চৌদ্দমনুর প্রকাশ হয়। ৪,৩২,০০,০০,০০০ সৌর বছরে ব্রহ্মার একদিন। এই হিসাবে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল একশত বছর। এইভাবে ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দ মনুর প্রকাশ হওয়ায় তাঁর একমাসে ৪২০ মনু প্রকট হন। এবং ব্রহ্মার এক বছরে ৫০৪০ মনু প্রকাশিত হন। ব্রহ্মার জীবনকাল একশত বছর হওয়ায় এই সময়ে ৫০৪০০০ মনু প্রকট হন। সৃষ্টিতে অসংখ্য ব্রহ্মান্ড আছে। তাই মোট মন্বন্তর অবতারের সংখ্যা অচিন্ত্যনীয়।

৫। যুগাবতার ঃ

যুগাবতারের নাম ঃ হরি, রাম, বলরাম, কল্কি।

যুগের নাম ঃ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি।

বর্ন ঃ শ্বেতবর্ন, রক্তবর্ন, শ্যামবর্ন, কৃষ্ণবর্ন।

প্রতি দ্বাপর যুগে বলরাম অবতীর্ণ হন। তবে ব্রহ্মার একদিনে যে বৈবস্বত মন্বন্তর হয়' তার দ্বাপর যুগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপর যুগে অবতীর্ন হন' তার পরবর্তী কলিযুগে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ন হন।

প্রশ্ন-৪ ঃ ঈশ্বর ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য কি। কাকে ঈশ্বর ও কাকে ভগবান বলব ?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর ও ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শব্দ দুটির প্রয়োগে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'ঈশ্' ধাতুর সাথে 'বরচ্' প্রত্যয় যোগে 'ঈশ্বর' শব্দ নিষ্পন্ন। ঈশ্ ধাতুর অর্থ কর্তৃত্ব করা। ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্তা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান, সকল কিছুর নিয়ন্তা। তিনি অনাদির আদি এবং সর্বকারণের কারণ। বাংলা ভাষায় পরম পুরুষ (সৃষ্টিকর্তা) হিসেবে 'ঈশ্বর' শব্দটি সকল ধর্মের মানুষ ব্যবহার করেন।

অপরপক্ষে সনাতন শাস্ত্রমতে ঈশ্বরকে যখন সমস্ত ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অধীশ্বর রূপে কল্পনা করা হয়; তখন তাঁর নাম হয় ভগবান। ভগবান =ভগ+বান,

'ভগ' শব্দের অর্থ 'ঐশ্বর্য' এবং 'বান' শব্দের অর্থ 'যুক্ত'। অর্থাৎ যিনি উপরোক্ত ষড় ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ তিনি ভগবান। জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর ব্রহ্ম, যোগীর কাছে তিনি পরমাত্মা, আবার ভক্তের কাছে তিনি ভগবান। ভগবান রসময় ও আনন্দময়। ভক্তের কাছে তিনি সাকার। এখানে অনুধাবনীয় যে, প্রয়োগ ক্ষেত্রে ভগবানকে নিরাকার কল্পনা করা হয় না এবং সনাতন ধর্মাবলম্বী ভিন্ন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা 'ভগবান' শব্দটি বাংলা ভাষায় পরমেশ্বর (সৃষ্টিকর্তা) হিসাবে ব্যবহার করেন না।

প্রশ্ন-৫ ঃ দেবী দূর্গার জন্ম বিবরণ জানতে চাই। দূর্গার বাবা ও মায়ের নাম কি ? শুনেছি দূর্গার সাত বোন-কথাটি কতটুকু সত্য।

প্রশ্নকর্তা ঃ শ্রীমতি সুমিরানী দেবী, শ্রী শ্রী নামহট্ট সংঘ, উত্তর শিববাড়ীয়া, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

উত্তর ঃ দেবী দূর্গার জন্ম বিবরণ জানার পূর্বে দূর্গা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। শব্দ কল্পদ্রুম নামক শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'দ' শব্দটি দৈত্য নামক, 'উ'-কার বিঘ্ননাশক, 'রেফ' রোগনাশক, 'গ' কার পাপ নাশক এবং 'আ' কার ভয় ও শত্রু নাশক। দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রু হতে যিনি রক্ষা করেন তিনি দূর্গা। স্কন্দ পুরানে বলা হয়েছে, রুরু দৈত্যের পুত্র দূর্গাসুরকে বধ করায় দেবী বিশ্ব লোকে পরিচিতা হয়েছেন দূর্গা নামে। আবার চন্ডীতে দেবীর স্বমুখে উক্তি 'দূর্গম নামক মহাসুরকে বিনাশ করে আমি প্রসিদ্ধা হব, দূর্গাদেবী নামে। ব্যাকরনগত সূত্রে 'দূর্গা' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় এই; দেবীর তত্ত্ব অতি অগম্য বা দুর্জ্ঞেয়, তাই তিনি দূর্গা।

দেবী দূর্গা এক মহাশক্তির রূপ বিগ্রহ। এ শক্তি রহস্য দুরধিগম্য। মুনি-ঋষি এবং মহাত্মাগন এ রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। কাজেই মানববুদ্ধির পক্ষে যেন এটি এক অসাধ্য ব্যাপার। এ শক্তি রহস্যকে তত্ত্ব ও ভাব-দু'প্রকারে কিছুটা জানা সম্ভব। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে এক মহাশক্তির ক্রিয়া বিদ্যমান। এ মহাশক্তি এক মায়া শক্তিও বটে। এ মহাশক্তিরূপা ভগবতীর দু'টি দিক-একটি তাঁর জগৎ পালিকা ও জগদাত্মিকা মায়ারূপ, অপরটি তাঁর জগতের অতীত অপরিচ্ছিন্ন অধিকারী রূপ। ভগবতীর মায়ামূর্ত্তির দু'টি রূপ- একটি মায়া অপরটি মহামায়া। মায়া-অবিদ্যা, মহামায়া-বিদ্যা। মায়া জীবকে ভগবৎ বিমুখ করে; মহামায়া জীবকে ভগবৎ অভিমূখী করে। এ মহামায়াই মহাবিদ্যা, দূর্গা, কালী, তারাঁ প্রভৃতি জগন্মাতার নানা মূর্তিতে বিভাসিতা। চন্ডীতে উল্লেখ রয়েছে 'মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা হাস্মৃতি।ম-(১/৭৭)। মহাবিদ্যা' রূপিনী সেই দূর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তির মধ্যে সেই ব্রহ্মময়ী মূর্তিরূপে আবির্ভূতা হন সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে।

মা দূর্গার নয়টি নামকরণ করেছেন পিতামহ ব্রহ্মা। ইহারা দেবীর কায়ব্যূহ মূর্তি। নব দূর্গা নামে ইহাদের খ্যাতি। নামগুলো হলো-শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিনী, চন্ডঘন্টা, কুষ্মান্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাতা। উল্লেখ্য বৃন্দাবন ধামে দেবী বিরাজিতা কাত্যায়নীরূপে। কাত্যায়নী দেবীর একটি কার্য্য আছে অনন্য সাধারণ। সেটি হল সুদূর্লভ কৃষ্ণভক্তি দান। মার্কন্ডেয় পুরাণে নানাবিধ প্রশস্তিমূলক গুনাগুন উল্লেখপূর্বক বিস্তৃতভাবে দেবী দূর্গার বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি এখানে চন্ডী, আদ্যাশক্তি মহামায়া হিসেবেও উল্লেখিত হয়েছেন। চৌদ্দ ভুবনময় এই জগৎকে দেবীধাম বলে। দূর্গাদেবী হচ্ছেন, এই দেবীধামের 'অধিষ্ঠাত্রী', যিনি দশভূজা, সিংহবাহিনী' পাপদমনী ও দূর্গতিনাশিনী।

পুরাকালে অসুরদের অধিপতি স্বর্গজয়ী মহিষাসুরকে নিধনের জন্য দেবতাগণের সম্মিলিত তেজ থেকে উদ্ভুত হন ভগবতী। দেবী দূর্গা সতী নামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দক্ষরাজের কন্যা হয়ে। জন্মান্তর হলো সতীর। গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে জন্ম নিলেন সতী উমা নামে। পর্বত রাজের কন্যা বলে অপর নাম পার্বতী। উপরোক্ত তথ্যসমূহ খুঁজতে গিয়ে দূর্গার সাতবোন সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে দূর্গা নামের সাথে সপ্ত মাতৃকাদের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এরা হলেন ব্রাহ্মনী, মহেশ্বরী, ইন্দ্রানী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও চামুন্ডা। মার্কন্ডেয় পুরানে দূর্গার সহায়িকা শক্তি হিসেবে মাতৃকাদের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। এখানে দূর্গার বিভূতি বা অংশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে মাতৃকাদের।

প্রশ্ন-৬ ঃ ধ্রুব যখন জন্মগ্রহন করেন, সেটা কোন যুগ ছিল।

উত্তর ঃ সত্যযুগে রাজা উত্তানপাদের ছোট রানী সুরুচির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম হয়। ধ্রুব আরাধনা করে শ্রীহরিকে লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন-৭ ঃ কৃষ্ণ পূজায় দূর্বা, বিল্বপত্র, রক্তচন্দন ব্যবহার করা হয় না কেন ?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। আর দেবদেবীরা তাঁরই সৃষ্টি এবং বিষয়ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক সেবিকা। প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে তুলসীকে তাঁর সেবা অর্ঘরূপে চরণে স্থান দিয়েছেন। অতপরঃ দেব দেবীরাও তাদের প্রিয় অন্যান্য কিছু উপাচার সেবাঅর্ঘরূপে গ্রহন করেছেন। বিশেষতঃ লক্ষী দেবী দূর্বা, স্বরসতী দেবী বিল্বপত্র, দূর্গা বা কালী রক্তচন্দন উপাচারে সন্তুষ্ট হন। ভগবানের প্রিয় কোন জিনিস দেব-দেবীরা যেমন প্রসাদ ছাড়া গ্রহন করেন না, তেমন কোন দেব-দেবীর বিশেষ প্রিয় উপাচারও ভক্তরা ভগবানের পূজায় দেন না। তাঁরা তাই শ্রীকৃষ্ণকে দূর্বা, বিল্বপত্র, রক্তচন্দন না দিয়ে তুলসী দিয়ে সর্বোত্তম সন্তুষ্ট করে অসীম কৃপা লাভ করে থাকেন। ●

উত্তর দাতা ঃ **শ্রী কিশোর কুমার মন্ডল।**
বি-বাড়িয়া।

কুইজ প্রতিযোগীতা

গত সংখ্যায় বর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তর নিম্নরূপ ঃ

১। অর্জুনের ছয়টি প্রশ্ন হলো ঃ ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, প্রকৃতি ও পুরুষ।

২। নরকের তিনটি দ্বার ঃ কাম, ক্রোধ, লোভ।

৩। দুই ধরনের জীবসত্ত্বা হলো ঃ নিত্যবদ্ধ জীব, নিত্যমুক্ত জীব।

৪। শরণাগতির ছয়টি অঙ্গ হলো ঃ দৈণ্য, আত্মনিবেদন, গোপত্ত্বির্থেবরণ, অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন, ভক্তির অনুকুল মাত্র কার্য্যের স্বীকার, ভক্তির প্রতিকুল কার্য্য বর্জন অঙ্গীকার।

৫। কর্মের ৫টি কারণ হলো ঃ দেহ, আত্মা, ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রচেষ্টা, পরমাত্মা।

গত সংখ্যায় বর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দাতাদের মধ্য হতে বিজয়ী হলেন-

প্রথম – শ্রী ভাবানন্দ সরকার, পরশমনি গীতা প্রচার ক্লাব, মাগুরাহাট, যশোর-৭৪০০।

দ্বিতীয় – সিমা ঘরামী, প্রযত্নে ঃ ধীরেন্দ্র নাথ ঘরামী, গ্রাম+পোঃ-হারতা, থানা ঃ উজিরপুর, বরিশাল।

কুইজ প্রতিযোগীতার নিয়ম হলো ঃ প্রতিটি প্রতিযোগীতায়ই মোট ৫টি করে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেয়া থাকিবে এবং প্রতিটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর প্রদান করতে হবে। যারা প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদানে সমর্থ হবেন, তাদের মধ্যহতে লটারির মাধ্যমে দু'জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

প্রথম বিজয়ীকে ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকাটি ২বৎসর এবং দ্বিতীয় বিজয়ীকে ১বৎসর বিনামূল্যে পাঠানো হবে।

চলতি সংখ্যায় প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। অর্জুন মহাশয়ের যুদ্ধ না করার ৫টি কারণ কি কি?

২। জড় জগতের মায়ার ফাঁদ কি ?

৩। ভগবদ্ভক্তির ক্ষয় নেই, ভক্তিযোগ অনুশীলন করলে সংসার রূপ মহাভয় থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতায় কোন্ অধ্যায় কত শ্লোকে তাহা ব্যক্ত করা হয়েছে?

৪। ভগবদ্গীতার শেষ উপদেশ কি ?

৫। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি ?

উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর আগামী ১৫ই মার্চ এর মধ্যে অবশ্যই 'অমৃতের সন্ধানে' ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

ভারতের বিবিধ ইসকন্ কেন্দ্রসমূহ

আগরতলা, ত্রিপুরা–আসাম-আগরতলা রোড, বনমালীপুর, ৭৯৯০০১

আহ্‌মেদাবাদ, গুজরাট-স্যাটেলাইট রোড, গান্ধীনগর হাইওয়ে ক্রসিং, আহ্‌মেদাবাদ ৩৮০০৫৪/টেলি- (০৭৯) ৬৭৪-৯৮২৭ অথবা ৯৯৪৫/ E-mail : jasomatinandan.acbsp@com.bbt.se

এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ – হরেকৃষ্ণ ধাম, ১৬১ কাশী নরেশ নগর, বালুয়াঘাট ২১১০০৩/টেলি- (০৫৩২) ৬৫৩৩১৮।

বামনবোর, গুজরাট–এন,এইচ, ৮-এ সুরেন্দ্রনগর জেলা।

ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক- হরেকৃষ্ণ হিল, ১-আর, ব্লক, চোর্ড রোড, রাজাজী নগর ৫৬০০১০/ টেলি- (০৮০) ৩৩২-১৯৫৬ ফ্যাক্স : (০৮০) ৩৩২-৪৮১৮/ E-mail : mpandit@giasbg01.vsnl.net.in

বারোদা, গুজরাট-হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, যোত্রি রোড-৩৯০০২১/টেলি- (০২৬৫) ৩২৬ ২৯৯/ ফ্যাক্স- (০২৬৫;৩৩১০১২)/ E-mail : baroda@com.bbt.se

বেলগৌম, কর্ণাটক–শুক্রাভর পিঠ, তিলক আদি ৫৯০০০৬

ভরতপুর, রাজস্থান : প্রযত্নে : জীবন নির্মান সংস্থান ১, গোলবাগ রোড, ৩২১০০১/টেলিফোন (০৫৬৪৪) ২২০৪৪, ফ্যাক্স : (০৫৬৪৪, ২৫৭৪২)

ভূবনেশ্বর, উড়িষ্যা : এন,এইচ, নং-৫ আই.আর.সি.ভিলেজ, ৭৫১০১৫/ টেলিঃ (০৬৭৪) ৪১৩৫১৭ বা ৪১৩৪৭৫/ E-mail: bhaktarupa..acbsp@ com.bbt.se

চন্ডিগড়-হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, দক্ষিণ মার্গ, সেক্টর ৩৬-বি, ১৬০০৩৬, টেলিঃ (০১৭২) ৬০১৫৯০/৬০৩২৩২

চেন্নাই, তামিলনাড়ু– ৫৯, বরকিট রোড, টি-নগর, ৬০০০১৭/ টেলিঃ (০৪৪) ৪৩৪–৩২৬৬ / ফ্যাক্সঃ(০৪৪)৪৩৪-৫৯২৯/ E-niail : bhanu.swami@com.bbt.se

কয়েম্বাটুর, তামিলনাড়ু– পদম্ ৩৮৭, ভি.জি.আর পুরম, অ্যালাগেসাম রোড-১;৬৪১০১১/টেলিঃ (০৪২২) ৪৩৫৯৭৮, ৪৪২৭৪৯/ফ্যাক্স : (০৪২২)৪৩৫৯৭৮, ৪৪৬৩৫৫/ E-mail :sarvaisvarya..jps@com.bbt.se

দ্বারকা-গুজরাট– ভারতীয়-ভবন, দেবী ভবন রোড, দ্বারকা ৩৬১৩৩৫/ টেলিঃ (০২৮৯২) ৩৪৬০৬/ফ্যাক্স : (০২৮৯২) ৩৪৩১৯

গৌড়ধাম : শ্রীশ্রী রাধা মাধব মন্দির, পশ্চিম বঙ্গ – হবীবপুর, রানাঘাট, নদীয়া, পিন - ৭৪১৪০৩/ টেলিঃ (০৩৪৭৩) ৫১৬৪০, ৫৮৮৪৬/E-mail : shyam-rup@pamho.net

গান্তার, অন্ধ্রপ্রদেশ : অপজিট্ শিবালয়ম, পেরা কাকনি- ৫২২৫০৯

গৌহাটী, আসাম – ৫৯ বারকিট্ রোড, টি-নগর ৬০০০১৭/টেলিঃ (০৪৪) ৪৩৪-৩২৬৬/ফ্যাক্স : (০৪৪) ৪৩৪-৫৯২৯/ E-mail : bhanu.swami@com.bbt.se

হনুমকুন্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ – নীলাদ্রী রোড, কুপুওয়ারা, ৫০৬০১১/ টেলিঃ (০৮৭১২) ৭৭৩৯৯

হরিদ্বার, উত্তর প্রদেশ– প্রভুপাদ আশ্রম, জি-হাউজ, নয়াবস্তি, ভীমগদা, হরিদ্বার ২৪৯৪০১/ টেলিঃ (০১৩৩) ৪২২৬৫৫, ৪২৫৮৪৯

হায়দেরাবাদ/অন্ধ্রপ্রদেশ–হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, নামপল্লী ষ্টেশন রোড ৫০০০০১/ টেলিঃ (০৪০) ৫৯২০১৮, ৫৫২৯২৪/ E-mail : hyderabad@com.bbt.se

ইম্ফল, মনিপুর–হরে কৃষ্ণ ল্যান্ড, এয়ারপোর্ট রোড, ৭৯৫০০১/ টেলিঃ (০৩৮৫) ২২১৫৮৭।

জয়পুর, রাজস্থান – জি-১১০ উদয় পথ, শ্যামনগর, ৩০২০১৯; পি ও বক্স নং- ২৭০, জয়পুর- ৩০২০০১/ টেলিঃ (০১৪১) ২১৪০২২/ফ্যাক্স : (০১৪১) ৩৭০-৯৪৭/ E-mail : Iskcon@jp1.vsn1.net.in

কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৩-সি এ্যালবার্ট রোড, ৭০০ ০১৭/ফোন : (০৩৩) ২৪৭-৩৭৫৭, ৬০৭৫/ফ্যাক্স : (০৩৩) ২৪৭-৮৫১৫/ E-mail : kolkata@com.bbt.se

কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৩১, লেক এভিনিউ, কোলকাতা-২৬, ফোন : ৪৬৬-৮৯৮১/৮৯৭৬

কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : গীতাভবন, ১১০ এ মতিলাল নেহেরু রোড, কোলকাতা-২৯ টেলিঃ ৪৭৪-৩৯৬৭

কাটরা, জম্মু ও কাশ্মীর– শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রম, শ্রীল প্রভুপাদ মার্গ, কালকা মাতা মন্দির, কাটরা (বৈষ্ণব মাতা) ১৮২১০১/ টেলিঃ (০১৯৯১) ৩৩০৪৭।

কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা– ৩৬৯ গোত্রি মহল্লা, মেইন বাজার, ১৩২১১৮/টেলিঃ (০১৭৪৪)২২৮০৬, ২৩৫২৯

লাক্‌নৌ, উত্তরপ্রদেশ - ১, আশোকনগর, গুরু গোবিন্দ সিং মার্গ, ২২৬০১৮

মাদ্রাজ- চেন্নাই দেখুন।

মাদুরাই, তামিলনাড়ু–৩২ চেলাঠামান কয়েল ষ্ট্রীট, সীমাজল এর নিকট, মাদুরাই ৬২৫০০১/টেলিফোন (০৪৫২) ৬২৭৫৬৫

ম্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক– হরে কৃষ্ণ আশ্রম, রোজারিও চার্চ রোড, পান্ডেশ্বর, ম্যাঙ্গালোর ৫৭৪০০১/ টেলিঃ (০৮২৪) ৪২০৪৭৪

মায়াপুর, পশ্চিমবঙ্গ–শ্রী মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, শ্রীমায়াপুর ধাম, জেলা-নদীয়া, (পোঃ বক্স নং : ১০২৭৯, বালিগঞ্জ, কোলকাতা -৭০০ ০১৯) ফোনঃ (০৩৪৭২) ৪৫২৩৯, ৪৫২৪০, ৪৫২৩৩/ফ্যাক্স : (০৩৪৭২) ৪৫২৩৮/E-mail :mayapur@com.bbt.se

মুইরাঙ্, মনিপুর : নংগবন ইস্থন, টিডিম রোড/টেলিঃ ৭৯৫১৩৩

মুম্বাই, মহারাষ্ট্র (বোম্বে)– হরে কৃষ্ণ ল্যান্ড, জুহু ৪০০০৪৯/টেলিঃ (০২২) ৬২০-৬৮৬০/ফ্যাক্স : (০২২) ৬২০-৫২১৪/E-mail : parijata.ms@com.bbt.se

মুম্বাই, মহারাষ্ট্র– ৭ কে এম, মুহসীন্ মার্গ, চৌপাটি, ৪০০,০৭/টেলিফোন (০২২) ৩৬৭-৪৫০০/ফ্যাক্স : (০২২) ৩৬৭-৭৯৪১/
E-mail : radha.krishna@com.bbt.se

মুম্বাই, মহারাষ্ট্র – শ্রুতি কমপ্লেক্স, মিরা রোড (পূর্ব) রয়েল কলেজের বিপরীতে / থানা – ৪০১১০৭/ টেলি : (০২২) ৮৮১-৭৭৯৫,৭৭৯৬/ফ্যাক্স : (০২২) ৮১১-৮৮৭৫

নাগপুর, মহারাষ্ট্র– জুনিয়র ভোনশ্লা প্যালেস, মহল, নাগপুর ৪৪০০০২/টেলি : (০৭১২) ৭৭৯২০১/ফ্যাক্স : (০৭১২) ৭২২৭২৭

নয়াদিল্লী – ১৪/৬৩ পাঞ্জাবীবাগ, ১১০০২৬/ ফোন (০১১) ৫৪১-০৭৮২

নয়াদিল্লী– সান্তনগর মেইন রোড (গরহী), নেহেরু প্যালেস কমপ্লেক্সের বিপরীতে, (পোঃ বক্স নং-৭০৬১) ১১০০৬৫/ ফোন (০১১) ৬২৩-৫১৩৩/ফ্যাক্স : (০১১) ৬৪৩-৩৫৪০/E-mail : ram.nam.gkg@com.bbt.se

পান্ধারপুর, মহারাষ্ট্র– হরেকৃষ্ণ আশ্রম, (চন্দ্রভাগা নদীর পাড়) জেলা-সোলাপুর-৪১৩৩০৪/ ফোন (০৭৩১৫) ৩৫১৫৯

পাট্‌না, বিহার– রাজেন্দ্রনগর রোড, নং-১২, ৮০০০১৬/ফোন (০৬১২) ৫০৭৬৫

পুনে, মহারাষ্ট্র- ৯,তারাপুর রোড, ক্যাম্প, ৪১১০০১/ফোন : (০২১২) ৬৬৭২৫৯।

পুরী, উড়িষ্যা– সিপাসোরোবলি পুরী, জেলা-পুরী /টেলি (০৬৭৫২) ২৪৫৯২/২৪৫৯৪

পুরী, উড়িষ্যা – ভক্তি কুঠী, স্বর্গদোয়ার, পুরী/টেলি (০৬৭৫২) ২৩৭৪০।

সেকেন্দ্রাবাদ–অন্ধ্রপ্রদেশ- ২৭, সেন্ট্ জনস্ রোড ৫০০০২৬/ফোন : (০৪০) ৮০৫২৩২/ফ্যাক্স : (০৪০) ৮১৪০২১/
E-mail : sahadeva.brs@com.bbt.se

শিলচর, আসাম–অম্বিকাপট্টী, শিলচর, চাষাড় জেলা-৭৮৮০০৪

শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ– গীতালপাড়া, ৭৩৪৪০৬/টেলি (০৩৫৩)৪২৬৬১৯/ফ্যাক্স : (০৩৫৩) ৫২৬১৩০/E-mail : siliguri@com.bbt.se

শ্রীরঙ্গম, তামিলনাড়ু–১৬-এ তিরুপতি ষ্ট্রীট, ত্রিচি, ৬২০০০৬/ফোন : (০৪৩১) ৪৩৩৯৪৫

সুরাট, গুজরাট– র‍্যান্দার রোড, জাহাঙ্গীরপুর, ৩৯৫০০৫/টেলি (০২৬১) ৬৮৫৫১৬, ৬৮৫৮৯১

সুরাট, গুজরাট– ভক্তিবেদান্ত রাজবিদ্যালয়, কৃষ্ণলোক, সুরাট, বারদোলী রোড, গঙ্গাপুর, পোঃ গঙ্গাধারা,জেলা–সুরাট-৩৯৪৩১০/ফোনঃ (০২৬১)৬৬৭০৭৫

তিরুবনন্তপুরম্ (ত্রিবান্দ্রাম), কেরালা– টি.সি. ২২৪/১৪৮৫ ডব্লিউ, সি, হাসপাতাল রোড, থাইকুড ৬৯৫০১৪/ফোনঃ (০৪৭১)৩২৮১৯৭/E-mail : sarvais-varya.jps@com.bbt.se

তিরুপতি, অন্ধ্রপ্রদেশ–কে.টি. রোড, বিনায়েক নগর ৫১৭৫০৭/টেলি (০৮৫৭৪) ২০১১৪।

উধমপুর, জম্মু ও কাশ্মীর– শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রম, প্রভুপাদ মার্গ, প্রভুপাদ নগর উধমপুর ১৮২১০১/টেলি (০১৯৯২) ৭০২৯৮

ভাদুধরা (বারুদা), গুজরাট– হরে কৃষ্ণ ল্যান্ড, যোত্রি রোড ৩৯০০২১/ফোন : (০২৬৫)৩২৬২৯৯/ফ্যাক্স : (০২৬৫) ৩৩১০১৩/E-mail : basu.ghosh.acbsp@com.bbt.se

বল্লভ বিদ্যানগর, গুজরাট– ইসকন্ হরেকৃষ্ণ ল্যান্ড, ৩৩৮১২০/টেলিফোন (০২৬৯২) ৩০৭৯৬।

বারানসী, উত্তর প্রদেশ– অন্নপূর্ণানগর, বিদ্যাপীঠ্ রোড, বারানসী ২২১০০১/টেলি (০৫৪২)৩৬২৬১৭।

বৃন্দাবন, উত্তর প্রদেশ– কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির, ভক্তিবেদান্ত স্বামী মার্গ, রমনরেতি, জেলা-মথুরা ২৮১১২৪/টেলিফোন (০৫৬৫) ৪৪২৪৭৮, ৪৪২৩৫৫/ ফ্যাক্স : (০৫৬৫) ৪৪২৫৯৬/ E-mail :
105146.1570@compuserve.com;(Gurukula:)vgurukula@ com.bbt.se

ফার্ম কমিউনিটি

আহমেদাবাদ জেলা, গুজরাট-হরে কৃষ্ণ ফার্ম, কাটোবারা (যোগাযোগ ইসকন্ আহমেদাবাদ)।

আসাম-কর্নমধু, জেলা-করিমগঞ্জ।

চামর্শী, মহারাষ্ট্র–৭৮ কৃষ্ণনগর ধাম,জেলা-গদাচিরোলী, ৪৪২৬০৩ /টেলি (০২১৮) ৬২৩৪৭৩

কর্নাটক-ভক্তিবেদান্ত ইকো-ভিলেজ, জেলাঃ নাগোনী, ভদোর উপত্যকা, হোসানগর তালুক, জেলা-শিবমোগা কর্ণাটক ৫৭৭৪২৫

মায়াপুর, পশ্চিমবঙ্গ (যোগাযোগ ইসকন্ মায়াপুর)

বিশেষ কারণবশতঃ এবারের সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলাম এবং সম্পাদকের নাম প্রকাশিত করা হলো না।

নারদ মুনির দ্বারকানগরী পরিদর্শন